

إلا الله فعسى أولئك أن

দারুল হারব দারুল ইআলাম

পরিচিতি প্রকারভেদ ও বিধান

মুফতি তারেকুজ্জামান

দারুল ইসলাম ও দারুল হারব

দারুল উল্লাম ও দারুল হারব পরিচিতি প্রকারভেদ ও বিধান

মুফতি তারেকুজ্জামান

সূচিপত্র

ভূমিকা/৩

দারুল ইসলাম ও দারুল হারব : প্রামাণ্য পর্যালোচনা/৪

প্রথম অধ্যায় :

‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-এর শরয়ি ভিত্তি/৫

দ্বিতীয় অধ্যায় :

‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-এর পরিচিতি/১০

তৃতীয় অধ্যায় :

‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-এর প্রকারভেদ ও প্রেক্ষিত ‘দারুল আমান’/২৪

দারুল আমান ও তার হাকিকত/৩১

চতুর্থ অধ্যায় :

দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের রূপান্তর/৩৭

পঞ্চম অধ্যায় :

‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধান/৫২

‘দারুল হারব’-এ বসবাস ও ভ্রমণ/৫২

জিম্মি, মুআহিদ ও মুসতা’মিন গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পরিভাষা/৫৮

বর্তমান বিশ্বে হারবি ও অ-হারবি কাফিরদের অস্তিত্ব/৬০

গণতান্ত্রিক দেশগুলোর বিধান/৬৩

গণতন্ত্র কুফরি হওয়ার প্রমাণসমূহ/৬৮

ভূমিকা

“দারুল হারব ও দারুল ইসলাম এমন দু’টি পরিভাষা, যা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে জানাটা বর্তমান সময়ে খুবই জরুরি। এটা শুধু তাত্ত্বিক আলোচনাই নয়; বরং এর সাথে জড়িয়ে আছে ইমান ও কুফরের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও। এছাড়াও এর সাথে হারবি ও জিম্মিদের জান-মালের বিধান এবং দারুল হারবে ভ্রমণ ও অবস্থানসহ নানা জরুরি মাসআলাও জড়িত, যা জানা বর্তমানে নানা প্রেক্ষাপটেই আবশ্যিক পর্যায়ে। তাই এগুলোকে তাত্ত্বিক আলোচনা বলে পাশ কাটিয়ে গেলে নিজেরই ক্ষতি। এসংক্রান্ত আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা ধারাবাহিক আলোচনা করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ। কারণ, বিষয়গুলো প্রতিটি মুসলিমের জন্য যেমনই জরুরি, তেমনই সেন্সিটিভ।

হালের সঙ্গিন এ মুহূর্তে যেখানে অপব্যখ্যা ও বিভ্রান্তি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, সেখানে ইমান-কুফরের মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে যদি আমাদের জানাশোনা কাঁচা থেকে যায়, কিংবা এ ব্যাপারে ন্যূনতম ধারণাও না রাখা হয়, তাহলে সামনে ভয়ংকর সব ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থেকে যায়। তাই এদিক-সেদিক সময় নষ্ট না করে আমাদের এসব বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। সময় বয়ে যায়, ফিতনার স্রোতধারা কিন্তু থেমে নেই। এগিয়ে আসছে ভয়ংকর তীব্রতা ও বিনাশী রূপ নিয়ে। এখন সময় ও শ্রম কোথায় কোথায় ব্যয় করতে হবে, তা প্রত্যেকের নিজেরই চিন্তা করে বের করা উচিত। সময় নষ্ট না করে এখন থেকেই সবার প্রস্তুতি গ্রহণ করা কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সময়ের সঠিক ব্যবহার করে যথাসময়ে সঠিক বিষয়গুলো জানা ও সে অনুযায়ী চলার তাওফিক দান করুন।”

দারুল ইসলাম ও দারুল হারব : প্রামাণ্য পর্যালোচনা

বর্তমান সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-এর পরিচিতি, প্রকারভেদ ও এসংক্রান্ত নানা বিধিনিষেধ জানা। গুরুত্বের বিচারে এটা অত্যন্ত জরুরি হলেও দুঃখের বিষয় যে, এ মাসআলার ব্যাপারে বর্তমানের অধিকাংশ মানুষই উদাসীন। সাধারণরা তো দূরে থাক; সত্য কথা হলো, অনেক আলিমেরও এ বিষয়ে তেমন অধ্যয়ন নেই। আর এজন্য তাদের বিভিন্ন দলিলবিহীন কথার কারণে অনেক মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ছে। তাই দীর্ঘ সময় ব্যয় করে কুরআন, হাদিস ও চার মাজহাবের ফুকাহায়ে কিরামের রায় সামনে রেখে এ বিষয়ে দলিলসমৃদ্ধ একটি আর্টিকেল তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলাম, যাতে ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’ নিয়ে সবার ভুল ধারণা দূর হয়ে এ বিষয়ে সঠিক ধারণার সৃষ্টি হয়। আল্লাহ-ই আমাদের সাহায্যকারী এবং তিনিই আমাদের উত্তম অভিভাবক।

আলোচনা ও বোঝার সুবিধার্থে আর্টিকেলটিকে আমরা মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করব। প্রথম অধ্যায়ে ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-এর শরয়ি ভিত্তি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’ এর সংজ্ঞা ও পরিচিতি, তৃতীয় অধ্যায়ে ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-এর প্রকারভেদ ও প্রেক্ষিত ‘দারুল আমান’, চতুর্থ অধ্যায়ে ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-এর রূপান্তর ও পঞ্চম অধ্যায়ে ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধিনিষেধ নিয়ে আলোচনা হবে। আমরা এ পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে বিস্তারিত ও প্রামাণ্য আলোচনা করার প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ।

প্রথম অধ্যায় :

‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-এর শরয়ি ভিত্তি

বর্তমানে কিছু লোক দেখা যায়, যারা ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’ পরিভাষা দুটিকে একেবারেই গুরুত্বহীন ও হালকা মনে করে থাকে। তাদের ধারণা, এসব যেহেতু ইজতিহাদি বিষয়, তাই ‘দার’-কে দু’ভাগে সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যিকীয় কিছু নয়; বরং এতে প্রকার আরও কমবেশ বা পরিবর্তন হতে পারে। অথচ এ পরিভাষা ও তার প্রকারভেদ সুদীর্ঘ বারো শতাব্দীকাল ধরে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে নিরবচ্ছিন্নধারায় চলে আসছে। আর তাই এটাকে একপ্রকার ইজমা দাবি করলেও অত্যুক্তি হবে না বোধহয়।

বস্তুত ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-এর শরয়ি উৎসমূল জানা থাকলে এসব পরিভাষা পরিবর্তন করে নতুন ইজতিহাদের দাবি করার দুঃসাহস কেউ দেখাত না। কেননা, হাদিস ও আসারের একাধিক বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, ‘দার’ সাধারণত দু’প্রকারেরই হয়ে থাকে। বিভিন্ন বর্ণনায় স্পষ্টভাবে বা ইঙ্গিতে এ প্রকারভেদের দলিল পাওয়া যায়। আমরা সেসব বর্ণনা থেকে এখানে কতিপয় বর্ণনা তুলে ধরছি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনাভিযানকালে একজন সেনাপতিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন :

وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلَالٍ -
فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ
أَجَابُوكَ، فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحْوِيلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى
دَارِ الْمُهَاجِرِينَ

‘আর যখন তোমার শত্রু মুশরিকদের সাক্ষাৎ পাবে, তখন তাদের তিনটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করবে। তারা এগুলো থেকে যেটাই গ্রহন করুক, তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। (প্রথমে) তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে। যদি তারা তোমার এ আহ্বানে সাড়া দেয়, তবে তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে নিবৃত্ত থাকবে। এরপর তুমি তাদেরকে তাদের ‘দার’

(এলাকা বা দেশ) থেকে মুহাজিরদের ‘দার’-এর দিকে চলে যাওয়ার আহ্বান জানানো।’ (সহিহ মুসলিম : ৩/১৩৫৭, হা. নং ১৭৩১, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াহিত তুরাসিল আরাবিয়া, বৈরুত)

এ হাদিসে ‘মুশরিকদের দার’ আর ‘মুহাজিরদের দার’ বলে স্পষ্টত ‘দার’ দুটি হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুশরিকদের ‘দার’-কে বলা হয় ‘দারুশ শিরক’ বা ‘দারুল হারব’। আর মুহাজিরদের ‘দার’-কে বলা হয় ‘দারুল হিজরাহ’ বা ‘দারুল ইসলাম’।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا، أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ

‘কোনো মুশরিক ইসলাম গ্রহণের পরও আল্লাহ তার কোনো আমল কবুল করেন না, যতক্ষণ না সে মুশরিকদের (এলাকা) ত্যাগ করে মুসলিমদের কাছে (এলাকাতে) চলে আসে।’ (সুনানুন নাসায়ি : ৫/৮২, হা. নং ২৫৬৮, প্রকাশনী : মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়া, হালব)

এ হাদিসে ‘মুশরিকদের (এলাকা) ত্যাগ করে মুসলিমদের কাছে (এলাকাতে) চলে আসে’ উক্তিটির মাঝে ‘দার’ দুটি হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ একটি হলো মুশরিকদের ভূমি, যাকে ‘দারুল হারব’ বলা হয়, আর অপরটি হলো মুসলিমদের ভূমি, যাকে দারুল ইসলাম’ বলা হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

عَفْرُ دَارِ الْإِسْلَامِ بِالشَّامِ

‘দারুল ইসলামের মূলভূমি হলো শামো’ (আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ৭/৫৩, হা. নং ৬৩৫৯, প্রকাশনী : মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়া, কায়রো)

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেন :

وَكَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ مُهَاجِرُونَ لِأَنَّ الْمَدِينَةَ كَانَتْ دَارَ شِرْكَ، فَجَاءُوا إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ

‘আর আনসারিদের মাঝেও কতিপয় মুহাজির ছিলেন। কেননা, (হিজরতের পূর্বে) মদিনা ছিল “দারুশ শিরক”। অতঃপর তথা হতে কতিপয় সাহাবি আকাবার রাতে (হিজরত করে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে চলে আসেন।’ (সুনানুন নাসায়ি : ৭/১৪৪, হা. নং ৪১৬৬, প্রকাশনী : মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়া, হালব)

খালিদ বিন অলিদ রা. খলিফাতুল মুসলিমিনের পক্ষ থেকে হিরায় পাঠানো চিঠিতে লিখেন :

وَجَعَلْتُ لَهُمْ أَيَّمَا شَيْخٍ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ أَوْ أَصَابَتْهُ آفَةٌ مِنَ الْأَقَاتِ أَوْ كَانَ غَنِيًّا فَافْتَقَرُ وَصَارَ أَهْلُ دِينِهِ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ طَرَحْتُ جَزِيَّتَهُ وَعَيْلٍ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. وَعِيَالُهُ مَا أَقَامَ بِدَارِ الْهَجْرَةِ وَدَارِ الْإِسْلَامِ؛ فَإِنْ خَرَجُوا إِلَى غَيْرِ دَارِ الْهَجْرَةِ وَدَارِ الْإِسْلَامِ؛ فَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ التَّفَقُّةَ عَلَى عِيَالِهِمْ.

‘আর আমি তাদের (জিম্মিদের) জন্য এটা নির্ধারণ করেছি যে, কোনো বৃদ্ধ যদি কাজকর্ম করতে অক্ষম হয়ে যায় অথবা কোনো বিপদে আক্রান্ত হয় অথবা সে ধনী ছিল, কিন্তু পরে দরিদ্র হয়ে গেছে এবং তার ধর্মের লোকেরা তাকে দান-সদকা করতে শুরু করে, তাহলে আমি তার জিজিয়া স্থগিত করে দেবো এবং বাইতুল মাল থেকে তার ও তার পরিবারের ভরণপোষণ দেওয়া হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত সে “দারুল হিজরাহ” ও “দারুল ইসলাম”-এ অবস্থান করবে। যদি তারা “দারুল হিজরাহ” ও “দারুল ইসলাম” থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে মুসলমানদের ওপর তাদের পরিবারের ভরণপোষণ বহন করার কোনো দায়িত্ব নেই।’ (আল-খারাজ, আবু ইউসুফ : পৃ. নং ১৫৭-১৫৮, প্রকাশনী : আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়া লিভুরাস)

এসব বর্ণনা থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’ পরিভাষা দুটি পুরোপুরি ইজতিহাদি নয়; বরং এ ব্যাপারে আলাদাভাবে নস পাওয়া যায়। এ নসগুলোতে যেমন ‘দারুল ইসলাম’ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি এটার পাশপাশি ‘দারুল হিজরাহ’ বা ‘দারুল মুহাজিরিন’ পরিভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত এগুলো সব একই ‘দার’-এর নানারকম নাম। অনুরূপ এসব বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ‘দারুল হারব’-কে ‘দারুশ শিরক’ ও ‘দারুল মুশরিকিন’-ও বলা হয়।

মোটকথা হাদিস ও আসারে আমরা দুটি ‘দার’-এর অস্তিত্ব পরিষ্কারভাবেই দেখতে পাই। এক : এমন দার, যেখানে মুসলিমরা হিজরত করে। এটাকে ‘দারুল হিজরাহ’ বা ‘দারুল ইসলাম’ বলে। দুই : এমন দার, যেখান থেকে অন্য ভূমিতে হিজরত করে চলে আসতে হয়। এটাকে ‘দারুল হারব’ বা ‘দারুশ শিরক’ বলে।

এছাড়াও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাঝে এটা সর্বজনস্বীকৃত আকিদা যে, ইসলাম ও কুফরের মাঝে তৃতীয় কোনো স্তর নেই। ব্যক্তি হয়তো মুমিন হবে, নয়তো কাফির হবে। গোমরাহ মু’তাজিলারাই একমাত্র ফিরকা, যারা ইসলাম ও কুফরের মাঝে তৃতীয় একটি স্তর নির্ধারণ করেছিল। তাদের ধারণা, এমন কিছু মানুষও আছে, যারা মুমিনও নয় আবার কাফিরও নয়। কিন্তু এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, মুমিন যতই গুনাহগার হোক না কেন, সে ইমানের গাঁপু থেকে বের হয়ে যায় না। হ্যাঁ, যার থেকে স্পষ্ট কুফর বা শিরক প্রকাশ পাবে এবং তার মধ্যে তাকফিরের কোনো প্রতিবন্ধকতাও পাওয়া যাবে না, তাহলে সে পরিষ্কার কাফির। দারের বিষয়টিও ঠিক এরূপই। হয়তো দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিংবা কুফর-শিরক প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকে; চাই সেটা পূর্ণাঙ্গ হোক বা অপূর্ণাঙ্গ, সেটাকে ‘দারুল ইসলাম’ বলা হবে। আর যদি কুফর-শিরক প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেটাকে ‘দারুল হারব’ বলা হবে। এ মাসআলাটি যার কাছে যতটা স্পষ্ট, তার কাছে ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-এর মাসআলাটিও ততটা স্পষ্ট হবে।

সুতরাং যারা মনে করে ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’ নতুন দুটি পরিভাষা, কুরআন-হাদিসে যার কোনো অস্তিত্ব নেই, তাদের এসব নস ভালো করে দেখা উচিত। আর যারা মনে করেন, এসব পরিভাষা পরিবর্তনশীল, তাদের কাছে মূলত

ইসলাম ও কুফরের বৈপরীত্য এবং ব্যক্তি ও ভূমির ওপর এর প্রায়োগিক দিকটি স্পষ্ট নয়। নতুবা ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন মুমিন ও কাফির হওয়ার বাইরে তৃতীয় কোনো অবস্থার কথা কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি ভূমির ব্যাপারেও ইসলামি ও কুফরি ভিন্ন অন্য কোনো গুণে গুণাঙ্কিত করার কথা ভাবা যায় না। ব্যক্তি যেমন হয়তো মুমিন, নয়তো কাফির; ভূমিও তেমনি হয়তো ইসলামি, নয়তো কুফরি হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-এর পরিচিতি

যেকোনো বিষয়ে ভালোভাবে জানতে বা বুঝতে হলে প্রথমে তার পরিচিতি ভালোভাবে জানতে হয়। তাই এ অধ্যায়ে আমরা ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-এর পরিচয় বা সংজ্ঞা তুলে ধরব। সংজ্ঞা বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা চার মাজহাবের ফুকাহায়ে কিরামের মত তুলে ধরব, যাতে ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-এর ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। প্রথমে আমরা এর আভিধানিক অর্থ নিয়ে আলোকপাত করব, এরপর তার পারিভাষিক বা শরয়ি অর্থ নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের ভাষ্য তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ।

আভিধানিক অর্থ :

এখানে আমরা এর শাব্দিক অর্থ ও সমর্থক কিছু শব্দ উল্লেখ করব, যেন শব্দের ভিন্নতায় বা ভুল শাব্দিক অর্থের কারণে কাউকে বিভ্রান্ত হতে না হয়। ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’ পরিভাষা দু’টিতে তিনটি শব্দ আছে। যথা : ‘দার’, ‘ইসলাম’ ও ‘হারব’। আমরা শব্দ তিনটির আলাদা আলাদা অর্থ বর্ণনা করে পরে সমষ্টিগত অর্থও বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

এক : ‘দার’। ‘দার’ অর্থ আঙিনা, ঘর ও মহল্লা। বসবাসের স্থানকে ‘দার’ বলা হয়। সাধারণত ‘দার’ বলতে শহর বুঝানো হয়ে থাকে। ‘দার’-এর বহুবচন হলো ‘দিয়ার’। একাধিক শহর মিলে গঠিত দেশকে ‘দিয়ার’ বলা হয়।

যেমন আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া-তে বলা হয়েছে :

الدَّارُ لُغَةً اسْمٌ جَامِعٌ لِلْعَرْصَةِ وَالْبِنَاءِ وَالْمَحَلَّةِ. وَفِي كَلِّياتِ أَبِي الْبَقَاءِ: الدَّارُ اسْمٌ لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَى بُيُوتٍ وَمَنَازِلٍ وَصَحْنٍ غَيْرِ مَسْفُوفٍ. وَهِيَ مِنْ دَارٍ يَدُورُ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكثْرَةِ حَرَكَاتِ التَّائِسِ فِيهَا وَاعْتِبَارًا بِدَوْرَانِهَا الَّذِي لَهَا بِالْحَائِطِ، وَجَمْعُهَا أَدُورٌ، وَدُورٌ، وَالْكَثِيرُ دِيَارٌ، وَهِيَ الْمَنَازِلُ الْمَسْكُونَةُ وَالْمَحَال. وَكُلُّ مَوْضِعٍ حَلَّ بِهِ قَوْمٌ فَهُوَ دَارُهُمْ، وَمِنْ هُنَا سُمِّيَتْ الْبَلَدَةُ دَارًا، وَالصَّفْعُ دَارًا. وَقَدْ تُطْلَقُ الدَّارُ عَلَى الْقَبَائِلِ مَجَازًا.

‘আববিত্তে ‘দার’-এর আভিধানিক অর্থ আঙিনা, ঘর ও মহল্লা। ‘দার’ বলতে সাধারণত কয়েকটি ঘর, বাড়ি ও ছাদবিহীন আঙিনা মিলে গঠিত এরিয়াকে বুঝানো হয়ে থাকে; যেমনটি আবুল বাকা রহ.-এর কুল্লিয়াতে বলা হয়েছে। শব্দটি دَارٌ يَدُورُ دَوْرًا ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত হয়েছে, যার অর্থ আবর্তিত হওয়া, চক্রর দেওয়া। ঘরকে ‘দার’ এজন্যই বলা হয় যে, মানুষ ঘরে বারবার নড়াচড়া (আসা-যাওয়া) করে এবং ঘর দেয়ালের চতুর্দিক থেকে বৃত্তাকারে আবর্তিত হয়ে থাকে। এর বহুবচন হলো: دُورٌ، وَدُورٌ وَدِيَارٌ। যে স্থান বা ভূখণ্ডে কোনো জাতি বসবাস করে, সেটাকে তাদের ‘দার’ বলা হয়। এজন্যই শহর ও ভূখণ্ডকে ‘দার’ বলা হয়। রূপক অর্থে ‘দার’ শব্দটি কখনো গোত্রের জন্যও ব্যবহার হয়ে থাকে।’ (আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া : ২০/১৯৮, প্রকাশনী : অজারা তুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ুনিল ইসলামিয়া, কুয়েত)

দুই : ‘ইসলাম’। ‘ইসলাম’ অর্থ আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা। এটা سلم থেকে নির্গত হয়েছে। সিন, লাম ও মিমযোগে গঠিত শব্দ অধিকাংশ সময় সুস্থতা ও নিরাপত্তার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইসলাম ধর্ম যেহেতু অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতা থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণভাবে আনুগত্য করে চলার নাম, তাই অর্থের মূল ধারণ করায় ‘ইসলাম’ নামটি আভিধানিকভাবে যথার্থ।

ইমাম ইবনে ফারিস রাজি রহ. বলেন :

(سَلِمَ) السَّيْنُ وَاللَّامُ وَالْمِيمُ مُعْظَمُ بَابِهِ مِنَ الصَّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ ; وَيَكُونُ فِيهِ مَا يَشُدُّ، وَالشَّادُّ عَنْهُ قَلِيلٌ، فَالسَّلَامَةُ: أَنْ يَسْلَمَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْعَاهَةِ وَالْأَذَى. قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ هُوَ السَّلَامُ ; لِسَلَامَتِهِ مِمَّا يَلْحَقُ الْمَخْلُوقِينَ مِنَ الْعَيْبِ وَالنَّقْصِ وَالْفَنَاءِ. قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ} [يونس : ২০]، فَالسَّلَامُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وَدَارُهُ الْجَنَّةُ. وَمِنَ الْبَابِ أَيْضًا الْإِسْلَامُ، وَهُوَ الْإِنْقِيَادُ ; لِأَنَّهُ يَسْلَمُ مِنَ الْإِبَاءِ وَالْإِمْتِنَاعِ

‘(সালিমা)। সিন, লাম ও মিমযোগে গঠিত অধিকাংশ শব্দে সুস্থতা ও মুক্তির অর্থ রয়েছে। কখনো ব্যতিক্রমও হয়; যদিও এর সংখ্যা নিতান্তই কম। অতএব, سلامة (সালামাহ) অর্থ বিপদ ও কষ্ট থেকে মানুষের নিরাপদ থাকা। উলামায়ে

কিরাম বলেন, আল্লাহ তাআলা হলেন سلام (সালাম)। যেহেতু তিনি দোষ, দ্রুটি ও বিনাশ হওয়া থেকে মুক্ত, যা মাখলুকের গুণাগুণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর আল্লাহ আহবান করেন শান্তি-নিরাপত্তার আবাসের দিকে।” [সূরা ইউনুস : ২৫] আল্লাহ হলেন শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা এবং জাম্বাত হলো তার (শান্তির) আবাস। এ শব্দ থেকেই এসেছে, الإسلام (আল-ইসলাম)। এর অর্থ মান্য করা, আনুগত্য প্রদর্শন করা। (সুস্থতা ও নিরাপত্তার অর্থের সাথে ইসলামের অর্থের পুরাই মিল রয়েছে।) কেননা, এটা অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতা থেকে (মুসলিমকে) নিরাপদ করে।’ (মাকায়িসুল লুগাহ : ৩/৯০, প্রকাশনী : ‘দারুল ফিকর, বৈরুত)

শরয়ি পরিভাষায় ‘ইসলাম’ বলা হয়, আল্লাহর পক্ষ হতে শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনিত দ্বীন ও জীবনব্যবস্থাকে। অর্থাৎ আল্লাহকে মাবুদ মেনে তাঁর দেওয়া সকল বিধান অবনত মস্তকে গ্রহণ করা এবং তাঁর প্রেরিত রাসুলের নির্দেশনা ও পদ্ধতি অনুসারে তা বাস্তবায়ন করার নামই হলো ইসলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘ইসলাম’-এর এ পারিভাষিক সংজ্ঞা ও পরিচিতির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন :

الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتُحْجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

‘ইসলামের সারমর্ম হলো, তুমি এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, জাকাত আদায় করবে, রমজান মাসের সিয়াম পালন করবে এবং সামর্থ্য থাকলে বাইতুল্লাহর হজ করবে।’ (সহিহ মুসলিম : ১/৩৬, হা. নং ৮, প্রকাশনী : দারুল ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্য, বৈরুত)

সুতরাং যেকোনো আনুগত্যের নামই ইসলাম নয়; বরং আনুগত্য হতে হবে একমাত্র আল্লাহর দেওয়া বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে। আবার শুধু বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে আনুগত্য করাই যথেষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তা শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দেখানো পদ্ধতির অনুকূলে হবে। অতএব, প্রকৃত ইসলাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনিত আল্লাহর

আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নাম। এতে যে কমবেশ করবে সে প্রকৃত ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।

তিন : ‘হারব’। ‘হারব’ শব্দের সাধারণ অর্থ যুদ্ধ। তবে এর আরও একাধিক অর্থ আছে। যেমন একটি অর্থ হলো বিদ্রোহ ও দূরত্ব। ‘দারুল হারব’ কথাটিতে এ দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য, প্রথম অর্থ নয়। কেননা, ‘দারুল হারব’ হওয়ার জন্য যুদ্ধ-কবলিত দেশ হওয়া জরুরি নয়; বরং তথায় কুফরি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলেই তা ‘দারুল হারব’ বলে গণ্য হয়। তাই সাধারণভাবে ‘দারুল হারব’ বলতে যুদ্ধ-কবলিত রাষ্ট্র হওয়ার যে ধারণা প্রচলিত আছে, তা পুরোপুরি সঠিক নয়।

ইমাম আবুল ফজল শামসুদ্দিন বা’লি রহ. বলেন :

قوله: "الْحَرْبُ" مَنَسُوبٌ إِلَى الْحَرْبِ، وَهُوَ الْقِتَالُ، وَدَارُ الْحَرْبِ، أَيُّ: دَارُ التَّبَاعُدِ وَالْبُعْضَاءِ، فَالْحَرْبُ بِالْإِغْتِبَارِ الثَّانِي.

“হারবি” কথাটি “হারব”-এর দিকে সম্বন্ধিত। “হারব” অর্থ যুদ্ধ, আর “দারুল হারব” অর্থ পরস্পরে দূরত্ব ও বিদ্রোহের দেশ। সুতরাং “হারবি” বলা হয় দ্বিতীয় অর্থের দিকে লক্ষ্য করে। (আল-মুতলি’ আলা আলফাজিল মুকনি : পৃ. নং ২৬৯, প্রকাশনী : মাকতাবাতুস সাওয়াদি)

বুঝা গেল, ‘দারুল হারব’ হওয়ার জন্য তথায় যুদ্ধ চলমান থাকা জরুরি নয়। ‘হারব’-এর প্রসিদ্ধ অর্থ ‘যুদ্ধ’ হলেও এখানে তার প্রসিদ্ধ অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়নি; বরং এখানে ‘দূরত’ ও ‘বিদ্রোহ’ অর্থ উদ্দিষ্ট। কাফির-শাসিত রাষ্ট্রের সাথে যেহেতু মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক ও হৃদয়তা নেই; বরং তাদের সাথে রয়েছে বিদ্রোহ ও শত্রুতার সম্পর্ক, তাই তাদের রাষ্ট্রকে ইসলামি পরিভাষায় ‘দারুল হারব’ বলা হয়।

অবশ্য ‘হারব’-এর প্রসিদ্ধ অর্থ ধরেও এর একটি ব্যাখ্যা করা যায়। সেটি হলো, ‘দারুল হারব’ অর্থ আমরা যুদ্ধের দেশ বা যুদ্ধ-কবলিত দেশও বলতে পারি। কেননা, এখানে বর্তমানে যুদ্ধ না থাকলেও এর উপযুক্ত হওয়াই তার এ নাম হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কাফির-শাসিত রাষ্ট্র পদানত করে তথায় আল্লাহর কালিমা প্রতিষ্ঠা করা যেহেতু ইসলামের নির্দেশ, বিধায় সেটাকে রূপক অর্থে যুদ্ধের দেশ

বলতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। অর্থাৎ বর্তমানে যুদ্ধ না থাকলেও সেটা যুদ্ধের উপযুক্ত একটি রাষ্ট্র। যেমন আমরা বলে থাকি, ‘ভাত রান্না হচ্ছে’। মূলত রান্না করা হয় চাল, কিন্তু সেটা যেহেতু শীঘ্রই ভাতে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে, বিধায় অগ্রীম তাকে ‘ভাত’ নামেও ডাকা হয়। কাফিরদের রাষ্ট্রের বিষয়টিও ঠিক এমনই। তথায় যুদ্ধ না থাকলেও ইসলামের দাবি অনুসারে শীঘ্রই তাদের সাথে যুদ্ধে জড়াতে হবে, সে হিসেবে অগ্রীম সে দেশকে ‘দারুল হারব’ বা যুদ্ধের রাষ্ট্র বলা এ দৃষ্টিকোণ থেকে পুরোপুরিই যৌক্তিক।

উল্লেখ্য যে, ‘দারুল হারব’-কে ফুকাহায়ে কিরাম ‘দারুশ শিরক বা ‘দারুল কুফর’ অভিধায়ও অভিহিত করে থাকেন। এ থেকেও প্রমাণ হয় যে, ‘দারুল হারব’ বলতে বাস্তবিক যুদ্ধ-কবলিত দেশ হওয়া জরুরি নয়। কেননা, পারিভাষিকভাবে ‘দারুশ শিরক’ বা ‘দারুল কুফর’ হলো তার সমর্থক শব্দ। আর এ দুটি শব্দের মধ্যে যুদ্ধের কোনো অর্থ বা ইঙ্গিত নেই। অতএব, শুধু ‘দারুল হারব’ শব্দ দেখেই এ ধারণা করা ভুল হবে যে, ‘দারুল হারব’ হওয়ার জন্য রাষ্ট্রকে প্রকৃতই যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হবে। এছাড়াও এ দু’টি অতিরিক্ত শব্দ থেকে এর পারিভাষিক অর্থের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। কেননা, যেরকমভাবে ‘দারুল ইসলাম’ পরিভাষাটিতে ‘দার’ শব্দটিকে ইসলামের দিকে ইজাফত (সম্বন্ধ) করা হয়েছে বিধায় তার সংজ্ঞায় বলা হয়, যে রাষ্ট্রে ইসলামি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সেটাই ‘দারুল ইসলাম’। অনুরূপ ‘দারুল কুফর বা ‘দারুশ শিরক’ পরিভাষাদ্বয়েও ‘দার’ শব্দটিকে কুফর বা শিরকের দিকে ইজাফত (সম্বন্ধ) করা হয়েছে বিধায় তার সংজ্ঞায় বলা হবে যে, যে রাষ্ট্রে কুফরি বা শিরকি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সেটাই ‘দারুল কুফর’ বা ‘দারুশ শিরক’। বস্তুত ‘দারুল কুফর’, ‘দারুশ শিরক ও ‘দারুল হারব’ এ তিনটির মাঝে শাব্দিক ব্যবধান ছাড়া পরিভাষাগত কোনো পার্থক্য নেই।

পারিভাষিক অর্থ :

কোনো সন্দেহ নেই যে, ‘দার’-এর পরিচয়ের ক্ষেত্রে মূল দেখার বিষয় হলো, কর্তৃত্ব, শক্তি ও রাজত্ব কার। যার রাজত্ব ও শাসনব্যবস্থা জারি থাকবে, তার ভিত্তিই ‘দার’-কে ‘দারুল ইসলাম বা ‘দারুল হারব’ বলা হবে। এখানে অন্য কোনো বিষয়, যেমন : নিজ ধর্মের জনসংখ্যা বেশি হওয়া, ধর্মের কিছু বিধান পালন করার সুযোগ থাকা ইত্যাদি বিবেচ্য হবে না। এগুলোর কারণে ‘দার’-এর

বিধানে কোনোরূপ পরিবর্তন আসবে না। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আমরা এখানে ‘দার’-এর সংজ্ঞা নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মতামত তুলে ধরছি।

১. ইমাম মালিক রহ. মক্কা বিজয়ের পূর্বের মক্কার ব্যাপারে বলেন :

وَكَاثَتِ الدَّارُ يَوْمَئِذٍ دَارَ الْحَرْبِ لِأَنَّ أَحْكَامَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ ظَاهِرَةً يَوْمَئِذٍ.

‘আর সেসময় মক্কা ছিল ‘দারুল হারব’। কেননা, তখন (মক্কায়) জাহিলি যুগের (কুফরি) আইন ও সংবিধান প্রতিষ্ঠিত ছিল।’ (আল-মুদাওওয়ানাতুল কুবরা : ১/৫১১, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

২. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. বলেন :

الدَّارُ إِذَا ظَهَرَ فِيهَا الْقَوْلُ بِخُلُقِ الْقُرْآنِ وَالْقَدَرِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ فَهِيَ دَارُ كُفْرٍ

‘কোনো ভূখণ্ডে যখন কুরআন মাখলুক হওয়ার মতবাদ, তাকদির অস্বীকার করার মতাদর্শ এবং এ জাতীয় অন্য কোনো কুফরি, শিরকি আকিদা বিজয়ী হবে, তখন সেটাকে “দারুল কুফর” বলা হবে।’ (আল-আকিদা, আবু বকর আল-খাল্লাল : পৃ. নং ১২৪, প্রকাশনী : দারুল কুতাইবা, দামেশক)

৩. ইমাম জাসাস হানাফি রহ. বলেন :

حُكْمُ الدَّارِ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالظُّهُورِ وَالْعَلْبَةِ، وَإِجْرَاءُ حُكْمِ الدِّينِ بِهَا، وَالذَّلِيلُ عَلَى صَحَّةِ ذَلِكَ: أَنَّا مَتَى غَلَبْنَا عَلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَأَجْرَيْنَا أَحْكَامَنَا فِيهَا: صَارَتْ دَارَ الْإِسْلَامِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَاخِجَةً لِدَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَمْ تَكُنْ، فَكَذَلِكَ الْبَلَدُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ، إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْكُفْرِ، وَجَرَى فِيهِ حُكْمُهُمْ: وَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ. وَلَا مَعْنَى لِإِعْتِبَارِ بَقَاءِ ذِمِّيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ أَمِنًا عَلَى نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ يَأْمَنُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَا يَسْلِبُهُ ذَلِكَ حُكْمَ دَارِ الْحَرْبِ، وَلَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ.

“দার”-এর ছকুম বিজয়, কর্তৃত্ব ও কোনো ধর্মের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার সাথে সম্পর্কিত। এ দাবির পক্ষে দলিল হলো, আমরা যখন “দারুল হারব”-

এর ওপর বিজয়ী হই এবং তথায় আমাদের শাসনব্যবস্থা চালু করি, তখন সেটা “দারুল ইসলাম” হয়ে যায়; চাই সে রাষ্ট্রটি কোনো “দারুল ইসলাম”-সংলগ্ন হোক বা না হোক। তাহলে অনুরূপ “দারুল ইসলাম”-এর কোনো শহরের ওপর যখন কাফিররা বিজয়ী হবে এবং তথায় তাদের কুফরি শাসনব্যবস্থা চালু হবে, তাহলে সেটা অবশ্যই “দারুল হারব”-এ পরিণত হয়ে যাবে। মুসলিম ও জিম্মিদের পূর্বের নিরাপত্তাচুক্তিতে তাদের নিরাপদ থাকাকে বিবেচনা করার কোনোই যৌক্তিকতা নেই। কেননা, মুসলমানও তো কখনও কখনও “দারুল হারব”-এ নিরাপদ থাকে; অথচ এর কারণে এটা রাষ্ট্রকে “দারুল হারব” হওয়া থেকে বের করে দেয় না এবং “দারুল ইসলাম”-এ রূপান্তরিত হয়ে যাওয়াকে আবশ্যিক করে না।’ (শারহু মুখতাসারিত তাহাবি : ৭/২১৬-২১৭, প্রকাশনী : দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়া, বৈরুত)

৪. ইমাম সারাখসি হানাফি রহ. স্বীয় ‘মাবসুত’-এ সাহিবাইনের-এর পক্ষ থেকে দলিল দিয়ে বলেন :

الْبُقْعَةُ إِنَّمَا تُنْسَبُ إِلَيْنَا أَوْ إِلَيْهِمْ بِاعْتِبَارِ الْقُوَّةِ وَالْغَلْبَةِ، فَكُلُّ مَوْضِعٍ ظَهَرَ فِيهِ حُكْمُ الشَّرِكِ فَالْقُوَّةُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِلْمُشْرِكِينَ فَكَانَتْ دَارَ حَرْبٍ، وَكُلُّ مَوْضِعٍ كَانَ الظَّاهِرُ فِيهِ حُكْمُ الْإِسْلَامِ فَالْقُوَّةُ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ.

‘স্থান আমাদের (মুসলমানদের) সাথে বা তাদের (কাফিরদের) সাথে সম্পৃক্ত হয় শক্তি ও বিজয়ের ভিত্তিতে। অতএব, যে জায়গায় শিরকের সংবিধান প্রতিষ্ঠিত থাকবে, বুঝতে হবে সেখানে মুশরিকদের শক্তি বিজয়ী; বিধায় সেটা হবে “দারুল হারব”। আর যে জায়গায় ইসলামের সংবিধান বিজয়ী থাকবে, বুঝতে হবে সেখানে মুসলমানদের শক্তি বিজয়ী।’ (আল-মাবসুত, সারাখসি : ১০/১১৪, প্রকাশনী : ‘দারুল মারিফা, বৈরুত)

তিনি শারহুস সিয়ারে আরও বলেন :

الْمَوْضِعُ الَّذِي لَا يَأْمَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ جُمْلَةِ دَارِ الْحَرْبِ، فَإِنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ اسْمٌ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ تَحْتَ يَدِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَامَةُ ذَلِكَ أَنْ يَأْمَنَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ.

‘যে স্থানে মুসলমানরা নিরাপদ নয়, সেটাও “দারুল হারব”-এর অন্তর্গত। কেননা, “দারুল ইসলাম” বলা হয় ওই জায়গাকে, যা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আছে। আর এর নিদর্শন হলো, তথায় মুসলমানরা নিরাপদে থাকবে।’ (শারহুস সিয়াবিল কাবির : পৃ. নং ১২৫৩, প্রকাশনী : আশ-শিরকাতুশ শারকিয়্যা)

তিনি আরও বলেন :

الْمُعْتَبَرُ فِي حُكْمِ الدَّارِ هُوَ السُّلْطَانُ فِي ظُهُورِ الْحُكْمِ

“‘দার’ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় হলো শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে (ইসলাম বা কুফরের) কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা।’ (শারহুস সিয়াবিল কাবির : পৃ. নং ১৭০৩, প্রকাশনী : আশ-শিরকাতুশ শারকিয়্যা)

৫. ইমাম ইবনে হাজাম জাহিরি রহ. বলেন :

الدَّارُ إِنَّمَا تُنْسَبُ لِلْغَالِبِ عَلَيْهَا، وَالْحَاكِمِ فِيهَا، وَالْمَالِكُ لَهَا.

‘দেশকে (ইসলাম বা কুফরের দিকে) সম্বন্ধিত করা হয় দেশটির বিজয়ী শক্তি, শাসক ও অধিকারীর ভিত্তিতে।’ (আল-মুহাল্লা : ১২/১২৬, প্রকাশনী : ‘দারুল ফিকর, বৈরুত)

৬. ইমাম কাসানি হানাফি রহ. সাহিবাইনের পক্ষে দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন :

أَنَّ قَوْلَنَا دَارُ الْإِسْلَامِ وَدَارُ الْكُفْرِ إِصَافَةٌ دَارٍ إِلَى الْإِسْلَامِ وَإِلَى الْكُفْرِ، وَإِنَّمَا تُصَافُ الدَّارُ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوْ إِلَى الْكُفْرِ لظُهُورِ الْإِسْلَامِ أَوْ الْكُفْرِ فِيهَا، كَمَا تُسَمَّى الْجَنَّةُ دَارَ السَّلَامِ، وَالنَّارُ دَارَ الْبَوَارِ؛ لَوْجُودِ السَّلَامَةِ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَوَارِ فِي النَّارِ وَظُهُورِ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ بِظُهُورِ أَحْكَامِهِمَا، فَإِذَا ظَهَرَ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِي دَارٍ فَقَدْ صَارَتْ دَارَ كُفْرٍ فَصَحَّتْ الْإِصَافَةُ، وَلِهَذَا صَارَتْ الدَّارُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ شَرِيطَةٍ أُخْرَى، فَكَذَا تَصِيرُ دَارُ الْكُفْرِ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا.

‘আমাদের “দারুল ইসলাম” ও “দারুল কুফর” কথা দু’টিতে “দার”-কে ইসলাম ও কুফরের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আর “দার”-কে ইসলাম ও কুফরের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয় তাতে ইসলাম কিংবা কুফর প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে। যেমন : জাম্মাতকে “দারুস সালাম” ও জাহান্নামকে “দারুল বাওয়ার” নামে ডাকা হয়; যেহেতু জাম্মাতে সালাম বা শান্তি রয়েছে আর জাহান্নামে বাওয়ার বা ধ্বংস রয়েছে। আর ইসলাম ও কুফর প্রতিষ্ঠিত হয় তার আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা। অতএব, যখন কোনো ভূখণ্ডে কুফরি আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন তা “দারুল কুফর” হয়ে যাবে। তাই “দার”-কে এভাবে ইসলাম কিংবা কুফরের সাথে সম্পৃক্ত করাটা সঠিক। এজন্য ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা লাভের দ্বারাই কোনো ভূখণ্ড “দারুল ইসলাম” হিসেবে গণ্য হয়। এই একটি মাত্র শর্ত ছাড়া এখানে আর কোনো শর্ত নেই। অনুরূপ “দারুল ইসলাম”-এ কুফরি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই সেটা “দারুল কুফর”-এ রূপান্তরিত হয়।’ (বাদায়িউস সানায়ি : ৭/১৩০-১৩১, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

৭. কাজি আবু ইয়াল্লা রহ. বলেন :

كُلُّ دَارٍ كَانَتْ الْعَلْبَةُ فِيهَا لِأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ دُونَ الْكُفْرِ فَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ.
وَكُلُّ دَارٍ كَانَتْ الْعَلْبَةُ فِيهَا لِأَحْكَامِ الْكُفْرِ دُونَ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ دَارُ
الْكُفْرِ.

‘প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড, যেখানে ইসলামি বিধিবিধান বিজয়ী, কুফরি সংবিধান নয়, তা “দারুল ইসলাম”। আর প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড, যেখানে কুফরি বিধিবিধান বিজয়ী, ইসলামি সংবিধান নয়, তা “দারুল কুফর”।’ (আল-মু’তামাদ ফি উসুলিদিন : পৃ. নং ২৭৬, প্রকাশনী : দারুল মাশরিক, বৈরুত)

৮. ইমাম ইবনে মুফলিহ মাকদিসি রহ. বলেন :

فَكُلُّ دَارٍ غَلَبَ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ فَدَارُ الْإِسْلَامِ وَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهَا
أَحْكَامُ الْكُفَّارِ فَدَارُ الْكُفْرِ وَلَا دَارَ لِغَيْرِهِمَا

‘প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড, যেখানে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত, তা “দারুল ইসলাম”। আর যদি কোনো ভূখণ্ডে কুফরি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে তা “দারুল কুফর”। এ দু’প্রকারের বাইরে আর কোনো “দার” নেই।’ (আল-আদাবুশ শারইয়্যা ওয়াল মিনহুল মারইয়্যা : ১/১৯০, প্রকাশনী : আলামুল কুতুব, বৈরুত)

৯. হাফিজ ইবনে কাইয়িম জাওজিয়া রহ. বলেন :

قَالَ الْجُمْهُورُ: دَارُ الْإِسْلَامِ هِيَ الَّتِي نَزَلَهَا الْمُسْلِمُونَ، وَجَرَتْ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ، وَمَا لَمْ تَجْرَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ دَارَ إِسْلَامٍ، وَإِنْ لَأَصَفَهَا، فَهَذِهِ الطَّائِفُ قَرِيبَةٌ إِلَى مَكَّةَ جِدًّا وَلَمْ تَصِرْ دَارَ إِسْلَامٍ بِفَتْحِ مَكَّةَ.

‘অধিকাংশ ফুকাহা বলেন, “দারুল ইসলাম” ওই ভূখণ্ডকে বলে, যেখানে মুসলমানরা বসবাস করে এবং তথায় ইসলামি বিধিবিধান চালু থাকে। আর যেখানে ইসলামি বিধিবিধান চালু থাকবে না, সেটা “দারুল ইসলাম” হবে না; যদিও তা ‘দারুল ইসলামের সাথে লাগোয়া অঞ্চল হোক। দেখো এই যে মক্কার অদূরেই অবস্থিত তায়িফ, মক্কা বিজয় সত্ত্বেও সেটা “দারুল ইসলাম” হয়ে যায়নি।’ (আহকামু আহলিজ জিম্মাহ : ২/৭২৮, প্রকাশনী : রামাদি, দাম্মাম)

১০. আল্লামা মানসুর বিন ইউনুস রহ. বলেন :

وَتَحِبُّ الْهَجْرَةَ عَلَى مَنْ يَعْجِزُ عَنْ إظهارِ دِينِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَهِيَ مَا يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الْكُفْرِ

“দারুল হারব”-এ অবস্থান করে যে ব্যক্তি দ্বীন প্রকাশ্যে পালন করতে অক্ষম হবে, তার জন্য হিজরত করা আবশ্যিক। আর “দারুল হারব” হলো এমন ভূখণ্ড, যেখানে কুফরের সংবিধান বিজয়ী।’ (কাশশাফুল কিনা’ আনিল ইকনা’ : ৩/৪৩, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

১১. ইমাম আবুল হাসান আলাউদ্দিন মুরাদাবি রহ. বলেন :

وَدَارُ الْحَرْبِ: مَا يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الْكُفْرِ.

‘আর “দারুল হারব” ওই ভূখণ্ডকে বলে, যেখানে কুফরি সংবিধান বিজয়ী থাকে।’
(আল-ইনসাফ ফি মারিফাতির রাজিহি মিনাল খিলাফ : ৪/১২১, প্রকাশনী :
দারুল ইহইয়াহিত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

১২. ইমাম ইবনে কুদামা রহ. বলেন :

وَمَتَى ارْتَدَّ أَهْلُ بَلَدٍ، وَجَرَتْ فِيهِ أَحْكَامُهُمْ، صَارُوا دَارَ حَرْبٍ فِي اغْتِنَامِ
أَمْوَالِهِمْ، وَسَبَى ذُرَارِيَّتِهِمُ الْحَادِثِينَ بَعْدَ الرَّدَّةِ، وَعَلَى الْإِمَامِ قِتَالُهُمْ،

‘যখন কোনো শহরবাসী মুরতাদ হয়ে যাবে এবং তাদের মাঝে তাদের (কুফরি)
সংবিধান চালু করবে তখন তাদের সম্পদ গনিমত হওয়া এবং মুরতাদ হওয়ার
পর জন্মগ্রহণ করা সন্তান-সন্ততিকে দাস-দাসী বানানোর ক্ষেত্রে তারা সবাই
“দারুল হারব”-এর অধিবাসী বলে বিবেচিত হবে। আর মুসলিম খলিফার ওপর
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আবশ্যিক হয়ে যাবে।’ (আল-মুগনি : ৯/১৭, প্রকাশনী
: মাকতাবাতুল কাহিরা, মিশর)

১৩. ইমাম শাওকানি রহ. বলেন :

الْأَعْتِبَارُ بِظُهُورِ الْكَلِمَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاحِي فِي الدَّارِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ
يَحِثُّ لَا يَسْتَطِيعُ مَنْ فِيهَا مِنَ الْكُفَّارِ أَنْ يَتَظَاهَرَ بِكُفْرِهِ إِلَّا لِكَوْنِهِ
مَأْذُونًا لَهُ بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهَذِهِ دَارُ إِسْلَامٍ وَلَا يَضُرُّ ظُهُورُ الْخِصَالِ
الْكُفْرِيَّةِ فِيهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَظْهَرْ بِقُوَّةِ الْكُفَّارِ وَلَا بِصَوْلَتِهِمْ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ
فِي أَهْلِ الدِّمَّةِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُعَاهِدِينَ السَّاكِنِينَ فِي الْمَدَائِنِ
الْإِسْلَامِيَّةِ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ الْعَكْسَ فَالدَّارُ بِالْعَكْسِ.

‘ধর্মের বিজয়ের ভিত্তিতে “দার” বিবেচ্য হবে। অতএব, যদি কোনো ভূখণ্ডে
আদেশ-নিষেধ জাতীয় সকল আইন-কানুন মুসলিমদের হয়, তথায় অবস্থানকারী
কাফিররা মুসলিমদের পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়া কুফরি কোনো কাজ
করার ক্ষমতা রাখে না, তাহলে এটা হলো “দারুল ইসলাম”। এ ভূখণ্ডে কিছু
কুফরি কাজকর্মের অস্তিত্ব থাকায় “দারুল ইসলাম” হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা
হবে না। কেননা, এসব কুফরি কাজ কাফিরদের শক্তি ও দাপটের ভিত্তিতে প্রকাশ

হয়নি; যেমনটি ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসরত ইহুদি, খ্রিষ্টান ও চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম জিম্মিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর বিষয়টি যদি এর (তথা “দারুল ইসলাম”-এর সংজ্ঞার) উল্টো হয়, তাহলে “দার”ও উল্টোটা (অর্থাৎ “দারুল হারব”) হবে।’ (আস-সাইলুল জাররার : পৃ. নং ৯৭৬, প্রকাশনী : দারু ইবনি হাজাম)

১৪. আল্লামা আব্দুল্লাহ আবু বাতিন রহ. বলেন :

فدار الإسلام هي التي تجري أحكام الإسلام فيها وإن لم يكن أهلها مسلمين، وغيرها دار كفر،

“দারুল ইসলাম” বলা হয়, যেখানে ইসলামের বিধিবিধান চলমান ও প্রতিষ্ঠিত আছে; যদিও তার অধিবাসীরা মুসলিম না হোক। আর এর বিপরীতটা (অর্থাৎ যেখানে কুফরি বিধিবিধান চলমান ও প্রতিষ্ঠিত, সেটা) হলো “দারুল কুফর”।’ (মাজমুআতুর রাসায়িলি ওয়াল মাসায়িলিন নাজদিয়া : ১/৬৫৫, প্রকাশনী : মাতবাতুল মানার, মিশর)

১৫. সাইয়িদ কুতুব শহিদ রহ. বলেন :

الأَوَّلُ : دَارُ الْإِسْلَامِ. وَتَشْمِلُ كُلَّ بَلَدٍ تُطَبَّقُ فِيهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ، وَتَحْكُمُهُ شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ... فَالْمَدَارُ كُلُّهُ فِي اعْتِبَارِ بَلَدٍ مَا دَارُ إِسْلَامٍ هُوَ تَطْبِيقُهُ لِأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَحُكْمُهُ بِشَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ. الثَّانِي : دَارُ الْحَرْبِ. وَتَشْمِلُ كُلَّ بَلَدٍ لَا تُطَبَّقُ فِيهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ، وَلَا يُحْكَمُ بِشَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ... فَالْمَدَارُ كُلُّهُ فِي اعْتِبَارِ بَلَدٍ مَا دَارُ حَرْبٍ هُوَ عَدَمُ تَطْبِيقِهِ لِأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَعَدَمُ حُكْمِهِ بِشَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ.

‘প্রথম হলো “দারুল ইসলাম”। এটা প্রত্যেক এমন ভূখণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেখানে ইসলামি বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা হয় এবং ইসলামি শরিয়ান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করা হয়। ...সুতরাং কোনো দেশ “দারুল ইসলাম” হওয়ার মূলভিত্তি হলো ইসলামি বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা এবং শরিয়ান অনুসারে বিচার-ফয়সালা করা। দ্বিতীয় হলো “দারুল হারব”। এটা প্রত্যেক এমন ভূখণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেখানে ইসলামি বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা হয় না এবং ইসলামি

শরিয়া অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করা হয় না। ...সুতরাং কোনো দেশ “দারুল হারব” হওয়ার মূলভিত্তি হলো ইসলামি বিধিবিধান বাস্তবায়ন না করা এবং শরিয়া অনুসারে বিচার-ফয়সালা না করা।’ (ফি জিলালিল কুরআন : ২/৩৪৮, প্রকাশনী : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা)

১৬. শাইখ মুহাম্মাদ সাদকি বিন আহমাদ গাজ্জি রহ. বলেন :

دَارُ الْحَرْبِ هِيَ الدَّارُ الَّتِي لَا يَأْمَنُ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ، وَلَا يُحْكَمُ فِيهَا بِشَرْعِ اللَّهِ، فَكُلُّ مَكَانٍ لَا يَأْمَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ، وَلَا يُحْكَمُ فِيهِ بِشَرْعِ اللَّهِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ دَارِ الْحَرْبِ.

“দারুল হারব” হলো ওই ভূখণ্ড, যেখানে মুসলমানরা নিরাপদ নয় এবং যেখানে আল্লাহর শরিয়ত অনুসারে বিচার-ফয়সালা করা হয় না। অতএব, যে জায়গায় মুসলিমরা নিরাপদ নয় এবং যেথায় আল্লাহর শরিয়ত অনুযায়ী বিচার করা হয় না, তা “দারুল হারব”-এর অন্তর্ভুক্ত।’ (মাওসুআতুল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়া : ৯/১৭৬, প্রকাশনী : মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

তিনি আরও বলেন :

فَالْمَكَانُ وَالْمَوْضِعُ وَالْبِلَادُ الَّتِي لَا يَأْمَنُ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِقَامَةِ شَعَائِرِ دِينِهِمْ وَعَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَلَا يُقَامُ فِيهَا شَرْعُ اللَّهِ هُوَ دَارُ الْحَرْبِ، وَالْمَكَانُ الَّذِي يَكُونُ تَحْتَ يَدِ الْمُسْلِمِينَ، وَفِيهِ يَأْمَنُونَ، وَيُحْكَمُ فِيهِ بِشَرْعِ اللَّهِ هُوَ دَارُ الْإِسْلَامِ.

‘অতএব যে স্থান, এলাকা ও দেশে মুসলমানরা নিজেদের দীন পালন এবং জাণ, ইজ্জত ও সম্পদের ক্ষেত্রে নিরাপদ নয় এবং যেখানে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করা হয় না, সেটাই হলো “দারুল হারব”। আর যে স্থান মুসলমানদের হাতে থাকবে, মুসলিমরা তথায় নিরাপদ থাকবে এবং সেখানে আল্লাহর আইন অনুসারে বিচার-ফয়সালা করা হবে, সেটা হলো “দারুল ইসলাম”।’ (মাওসুআতুল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়া : ১১/১১৪৪, প্রকাশনী : মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

এসব ফকিহ ও উসুলবিদের ভাষ্য থেকে ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-এর অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জনগণের আধিক্য কিংবা কিছু ধর্মীয় বিধিবিধান বা রীতিনীতি পালনের সুযোগ থাকার কারণেই কোনো দেশকে ‘দারুল ইসলাম’ বা ‘দারুল হারব’ বলা হবে না; বরং মূলে দেখতে হবে যে, সে দেশের সংবিধান ও শাসনক্ষমতা কাদের হাতে। যদি শাসনক্ষমতা মুসলিমদের হাতে থাকে এবং দেশের সংবিধান ও বিচারব্যবস্থা শরিয়ামতে চলে তাহলে সে দেশকে ‘দারুল ইসলাম’ বলা হবে। এক্ষেত্রে এটা বিবেচ্য নয় যে, দেশের অধিকাংশ জনগণের ধর্ম কী। চাই সবাই জিম্মি কাফির হোক বা সবাই মুসলিম হোক কিংবা কমবেশ করে উভয় শ্রেণির জনগণ থাকুক। এসবের কারণে ‘দারুল ইসলাম’ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না। এর বিপরীতে যদি দেশের শাসনক্ষমতা কাফিরদের হাতে থাকে কিংবা মুর্তাদ ও নামধারী মুসলমানের হাতে থাকলেও কুফরি ও মানবরচিত আইনে দেশ পরিচালনা করা হয় এবং এসব মানবরচিত আইনকেই শরিয়ার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাহলে এটাকে ‘দারুল হারব’ বলা হবে; যদিও দেশের সিংহভাগ নাগরিক মুসলমান হোক এবং দেশে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন ইবাদত পালনের সুযোগ বহাল থাকুক।

তৃতীয় অধ্যায় :

‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-এর প্রকারভেদ ও প্রসিদ্ধিত ‘দারুল আমান’

আমাদের জানা থাকা দরকার যে, সব ‘দারুল হারব’ ও ‘দারুল ইসলাম’ এক ক্যাটাগরির নয়। শ্রেণিগতভাবে এগুলোর রয়েছে নানা ভাগ। নিম্নে আমরা এসংক্রান্ত সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করছি। প্রথমে ‘দারুল ইসলাম’-এর প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব, এরপর ‘দারুল হারব’-এর প্রকারভেদ ও বিশেষভাবে ‘দারুল আমান’ নিয়ে কথা বলব, ইনশাআল্লাহ।

প্রথমত আমাদের আলোচনা হলো ‘দারুল ইসলাম’-এর প্রকারভেদ নিয়ে। ‘দারুল ইসলাম’-এর প্রসিদ্ধ ও পরিচিত সংজ্ঞা আমরা ইতিপূর্বে জেনে এসেছি। এছাড়াও ‘দারুল ইসলাম’-এর আরও তিনটি প্রকার রয়েছে। যথা, এক : দারুল বাগয়ি। দুই : দারুল ফিসক। তিন : দারুল আহলিজ জিম্মাহ।

‘দারুল বাগয়ি’ বলা হয় এমন ভূখণ্ডকে, যা শক্তিশালী কোনো মুসলিম দল খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আলাদা করে নিয়েছে এবং তথায় ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন ‘আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া-তে বলা হয়েছে :

دَارُ الْبَغْيِ هِيَ: نَاحِيَّةٌ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ تَحْتَزُّ إِلَيْهَا مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ شَوْكَةٌ خَرَجَتْ عَلَى طَاعَةِ الْإِمَامِ بِتَأْوِيلٍ.

“‘দারুল বাগয়ি’ হলো “‘দারুল ইসলাম’-এর একটি অঞ্চল, যা মুসলমানদের মধ্য হতে শক্তিশালী একটি দল দখল করে নিয়েছে, যারা তাবিল (বিদ্রোহকে বৈধ করার ব্যাপারে কোনো অজুহাত ও ব্যাখ্যা পেশ) করে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।’ (আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া : ২০/২০১, প্রকাশনী : অজারাতুল আওকাফ ওয়াশ শূয়ুনিল ইসলামিয়া, কুয়েত)

আর ‘দারুল ফিসক’ বলা হয় এমন ভূখণ্ডকে, যেখানে গুনাহ, অশ্লীলতা ও পাপাচার এমনভাবে বেড়ে যায় যে, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাটা বেশ দুষ্কর হয়ে পড়ে। যেমন ‘আল-জামিউ ফি তালাবিল ইলমি’-তে বলা হয়েছে :

دار الفسق: وهي ما إذا شاع الفسق ببلد في دار الإسلام،

“দারুল ফিসক” হলো “দারুল ইসলাম”-এর অন্তর্গত এমন অঞ্চল, যেখানে নাফরমানি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।’ (আল-জামিউ ফি তালাবিল ইলমি : ২/৬৪৬, প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ)

আর ‘দারু আহলিজ জিম্মাহ’ বলা হয় এমন ভূখণ্ডকে, যার অধিবাসীরা হবে জিম্মি (‘দারুল ইসলাম’-এ জিজিয়া দিয়ে বসবাস করা অমুসলিম নাগরিক) এবং তাদের দেশে ও বিচার-আদালতে ইসলামি আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন :

وَإِنْ حَاصَرَ أَمِيرُ الْعَسْكَرِ أَهْلَ مَدِينَةٍ مِنْ مَدَائِنِ الْعَدُوِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نُسَلِّمُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَصِيرُ ذِمَّةٍ وَلَا نَبْرُحُ مَنَازِلَنَا، فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَقُودُونَ عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا مَعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَقْوَى عَلَى قِتَالِ مَنْ يَخْضَرُ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَيَحْكُمُ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، فَعَلَ ذَلِكَ الْأَمِيرُ.

‘মুসলিমদের সেনাপতি শত্রুদের কোনো শহর অবরোধ করার পর যদি কিছু শহরবাসী বলে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করব, আর অন্যরা বলে, আমরা জিম্মি হয়ে থাকব এবং আমাদের বাসস্থানেই অবস্থান করব, তখন দেখতে হবে, যদি মুসলমানরা সেখানে এমন কোনো মুসলমানকে (শাসক হিসেবে) নিয়োগ দিতে পারে, যে তাদের সাথে যোগদান করা হারবি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম এবং তাদের মাঝে ইসলামি বিধিবিধান চালু করতে পারে তাহলে সেনাপতি তা করতে পারবে।’ (শারহুস সিয়াবিল কাবির : পৃ. নং ২১৯৬, প্রকাশনী : আশ-শিরকাতুশ শারকিয়া)

ইমাম সারাখসি রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন :

لَأَنَّ إِجْرَاءَ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِهِمْ مُمَكِّنٌ، وَالذَّارُ تُصِيرُ دَارَ الْمُسْلِمِينَ بِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ، فَيَجْعَلُهَا الْإِمَامُ دَارَ إِسْلَامٍ وَيَجْعَلُ الْقَوْمَ أَهْلَ ذِمَّةٍ.

‘কেননা, তাদের দেশে মুসলমানদের আইন-কানুন চালু করা সম্ভব এবং সেখানে

মুসলমানদের আইন-কানুন চালু করার দ্বারা সেটা মুসলমানদের দেশ হয়ে যাবে। অতএব, খলিফা সে দেশকে “দারুল ইসলাম” বলে সাব্যস্ত করবেন এবং জনগণকে গণ্য করবেন জিম্মি হিসেবে।’ (শারহুস সিয়ারিল কাবির : পৃ. নং ২১৯৭, প্রকাশনী : আশ-শিরকাতুশ শারকিয়্যা)

দ্বিতীয়ত আমাদের আলোচনা ছিল ‘দারুল হারব’-এর প্রকারভেদ ও বিশেষভাবে ‘দারুল আমান’-এর আলোচনা নিয়ে। ইতিপূর্বে আমরা ‘দারুল ইসলাম’-এর অতিরিক্ত তিনটি প্রকার ও তার পরিচয় জেনে এসেছি। এখানে আমরা ‘দারুল হারব’-এর প্রকারগুলো একসাথে আলোচনা না করে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলাদা আলাদা করে করব, যেন সবগুলো প্রকার ও প্রকারভেদের কারণ বুঝতে সহজ হয়।

প্রথমত ‘দারুল হারব’-এ কুফরি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিক থেকে ‘দারুল হারব’-কে মোট তিন ভাগ করা যায়। যথা : এক. ‘দারুল হারবিল আসলি’। দুই. ‘দারুল হারবিত তারি’। তিন : ‘দারুল রিদ্দা’। ‘দারুল হারবিল আসলি’ বলা হয় এমন কুফরি রাষ্ট্রকে, যেখানে পূর্ব থেকেই কুফরি শাসনব্যবস্থা চলে আসছে। আগে বা পরে কখনো তথায় ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যেমন : আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান ইত্যাদি। আর ‘দারুল হারবিত তারি’ বলা হয় এমন কুফরি রাষ্ট্রকে, যেখানে কখনো ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে মুসলমানদের গাফলতি বা অন্য কোনো কারণে ইসলামি শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে সেখানে আসলি কাফিরদের কুফরি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন : স্পেন, ফ্রান্স, ইটালি, উত্তর আফ্রিকা, ভারত ইত্যাদি। আর ‘দারুল রিদ্দা’ বলা হয়, এমন কুফরি রাষ্ট্রকে, যেখানে কখনো ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে সেখানে মুসলিম নামের মুরতাদরা শাসনক্ষমতায় এসে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানবরচিত কুফরি সংবিধান চালু করেছে। বর্তমানের অধিকাংশ মুসলিম দেশ এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে ইসলামের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কুফরি আইনকানুন চালু রয়েছে।

আল্লামা আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ রহ. বলেন :

من جهة كون الكفر فيها قديما أو طارئاً، تنقسم إلى:

অ — দারুল কফর الأصلي: وهي التي لم تكن دار إسلام في وقت من الأوقات مثل اليابان وشرق الصين وانجلترا وقارات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا.

ب — দারুল কফর الطاريء: وهي التي كانت دار إسلام في وقت من الأوقات ثم استولى عليها الكفار الأصليون مثل الأندلس (إسبانيا والبرتغال) وفلسطين ودول شرق أوروبا التي كانت تحت حكم الدولة العثمانية مثل رومانيا وبلغاريا ويوغوسلافيا واليونان وألبانيا.

ج — دار الردة: وهي فرع من دار الكفر الطاريء، وهي التي كانت دار إسلام في وقتٍ ما ثم تغلب عليها المرتدون وأجروا فيها أحكام الكفار، مثل الدول المسماة اليوم بالإسلامية

‘কুফরিটা আদি ও অনাদি হওয়া নিয়ে “দারুল হারব” কয়েকভাগে বিভক্ত। এক. আসলি (প্রকৃত) দারুল কুফর। এটা ওই দেশ, যা কোনো সময়েই দারুল ইসলাম ছিল না। যেমন : জাপান, পূর্ব চীন, ইংল্যান্ড, উত্তর আমেরিকা মহাদেশ, দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া। দুই. তারি (পরে আগত ও পরিবর্তিত) দারুল কুফর। এটা ওই দেশ, যা কোনো এক সময় “দারুল ইসলাম” ছিল। এরপর আসলি কাফিররা (যারা বংশসূত্রে কাফির) তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। যেমন : স্পেন, পর্তুগাল, ফিলিস্তিন, পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো, যা উসমানি খিলাফতের অধীন ছিল, যেমন রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস ও আলবেনিয়া। তিন. দারুল রিদ্বা। এটা বস্তুত তারি দারুল কুফরেরই একটি প্রকার ও শাখা। এটা ওই দেশ, যা কোনো এক সময় “দারুল ইসলাম” ছিল। অতঃপর মুরতাদরা (যারা বংশসূত্রে মুসলিম হলেও পরে নানা কুফরি কর্মকাণ্ড করায় প্রকৃত অর্থে কাফির) তা জবরদখল করে সেখানে কাফিরদের আইনকানুন চালু করেছে। যেমন : বর্তমানের নামসর্বস্ব ইসলামি রাষ্ট্রগুলো।’ (আল-জামিউ ফি তালাবিল ইলম : ২/৬৪৫, প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ)

‘দারুল হারব’-এ কাফির বা মুরতাদদের কুফরি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি আবার দু’প্রকারের হতে পারে। এক. ইসতিলায়ে তাম। দুই. ইসতিলায়ে নাকিস। ‘ইসতিলায়ে তাম’ বলা হয় এমন কর্তৃত্বকে, যা নিজেদের কুফরি আইন ও শাসনব্যবস্থার বিপরীতে ভিন্ন কোনো আইন বা বিধানের স্বীকৃতি দেয় না। বরং ভিন্ন কোনো আইন ও নিয়মকানুন অনুসরণ করলে তাকে হত্যা, বা বন্দী করা হয় এবং তাকে চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন : চীন, উত্তর কোরিয়া ইত্যাদি। আর ইসতিলায়ে নাকিস বলা হয় এমন কর্তৃত্বকে, যা নিজেদের কুফরি আইন-কানুন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ভিন্নধর্মীদের জন্য সীমিত পরিসরে ধর্ম পালন করার সুযোগও দিয়ে থাকে। তবে শর্ত হলো, সেটা তাদের কুফরি আইন-কানুন ও মানবরচিত দর্শনের সাথে কোনোভাবেই সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। যেমন : তাতারিদের যুগে শাম ও পাশ্চবর্তী কিছু অঞ্চলের ক্ষেত্রে এমনটা দেখা গিয়েছিল এবং যেরকমভাবে বর্তমানে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক কুফরি রাষ্ট্রসমূহে দেখা যায়। এসব অঞ্চলে যদিওবা ইসলামি কিছু বিধিবিধান পালনের সুযোগ থাকে, কিন্তু সেটা মুসলমানদের কর্তৃত্বের বলে নয়; বরং কাফির ও তাগুত শাসকেরা এর অনুমোদন দেওয়াতেই সেটা সম্ভব হয়। তাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমোদন সাপেক্ষে কিছু ইবাদত পালনের সুযোগ পাওয়াতে কোনো দেশকে ‘দারুল ইসলাম’ বলা যাবে না। কেননা, সেখানে সবকিছুই হয় তাগুত সরকারের মর্জি মোতাবেক। তাদের পরিষ্কার নীতি হলো, সবকিছু তাদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। অনুমোদন দিলে তবেই করতে পারবে, তাতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু নিজেদের কোনো স্বার্থে বা রাজনৈতিক কোনো কারণে বা ভিন্ন যেকোনো কারণে অনুমোদন না দিলে তা আর পালন করার সুযোগ থাকে না। এটা মূলত স্পষ্টই পরাধীনতা, যা অনেক বোকা মানুষ না বুঝে ভাবে যে, দেশে তো মোটামুটি ইসলামি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ইসলামও পালন করা যাচ্ছে! আর এরই ভিত্তিতে অনেকে তো এ ধরনের দেশকে ‘দারুল ইসলাম’ও ঘোষণা দিয়ে দেয়!!

আল্লামা আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ রহ. বলেন :

استيلاء الكفار على دار الإسلام وهو نوعان:

أ — الاستيلاء التام: وهو ما إذا تغلب الكفار على دار إسلام وأجروا فيها أحكام الكفر. فهذه تصير دار كفر لتحقيق المناط فيها...

ب — الاستيلاء الناقص: وهو ما إذا تغلب الكفار على دار إسلام ولكن بقيت أحكام الإسلام هي الجارية في الدار.

“দারুল ইসলাম”-এর ওপর কাফিরদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা দু’প্রকারের। এক : ইসতিলায়ে তাম। এটা বলা হয় এমন কর্তৃত্বকে, যার ভিত্তিতে কাফিররা “দারুল ইসলাম”-এর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সেখানে কুফরি বিধিবিধান চালু করে। এক্ষেত্রে “দারুল হারব”-এর ভিত্তি ও কারণ বিদ্যমান থাকায় এটা “দারুল হারব”-এ পরিণত হয়ে যাবে। দুই : ইসতিলায়ে নাকিস। এটা বলা হয় এমন কর্তৃত্বকে, যার ভিত্তিতে কাফিররা “দারুল ইসলাম”-এর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু সেখানে (পূর্বে চালু করা) ইসলামি বিধিবিধান যথারীতি বহাল থাকে।’ (আল-জামিউ ফি তালাবিল ইলম : ২/৬৪৭-৬৪৮, প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ)

আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান রহ. বলেন :

فمضى علمنا يقيناً ضرورياً بالمشاهدة أو السماع المتواتر أنّ الكفّار استولوا على بلدٍ من بلاد الإسلام التي تليهم، وغلبوا عليها وقهروا أهلها، بحيث لا يتمّ لهم إبراز كلمة الإسلام إلا بجوارٍ من الكفار: صارت دار حرب وإن أقيمت فيها الصّلاة.

‘অতএব, যখন আমরা সরাসরি পর্যবেক্ষণ বা পারম্পরিক ধারায় শ্রবণের মাধ্যমে সুনিশ্চিতভাবে জানতে পারব যে, কাফিররা তাদের পাশ্চাত্য কোনো ইসলামি রাষ্ট্রের ওপর কতৃত্ব অর্জন করে বিজয় অর্জন করেছে এবং এর নাগরিকদের এমনভাবে পরাজিত করেছে যে, কাফিরদের নিরাপত্তাপ্রাপ্তি ছাড়া তাদের প্রকাশ্যে ইসলামের কালিমা বলারও সুযোগ নেই, তখন সেটা “দারুল হারব” বলেই বিবেচিত হবে; যদিও তথায় সালাত প্রতিষ্ঠা করা হোক।’ (আল-ইবরাতু মিন্মা জাআ বিল-গাজবি ওয়াশ-শাহাদাতি ওয়াল-হিজরাহ : পৃ. নং ২৩৬-২৩৭, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

সুতরাং ‘দারুল হারব’ চাই আসলি হোক বা তারি, অনুরূপ তাতে ইসতিলায়ে তাম থাকুক বা নাকিস সর্বাবস্থায়ই এ দেশগুলোর সাথে ‘দারুল হারব’-এর মতোই আচরণই করা হবে। যদিও এসব দেশে বসবাস করা বা হিজরতের আবশ্যকীয়তার

মাঝে এ প্রকারগুলো বিধানগত কিছুটা পার্থক্য সৃষ্টি করবে। অতএব, যারা কোনো দেশে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম নাগরিক কিংবা দেশে কিছু ইসলামি বিধিবিধান পালনের সুযোগ থাকায় দেশকে ‘দারুল ইসলাম’ বলে মনে করে, তাদের এ মাসআলায় বড় ধরনের ভ্রম ঘটেছে।

এরপর নিরাপত্তার দিক থেকে ‘দারুল হারব’-কে আবার দু’ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক. ‘দারুল খাওফ’। দুই. ‘দারুল আমান’। ‘দারুল খাওফ’-কে ‘দারুল ফিতনা’ আর ‘দারুল আমান’-কে কখনো ‘দারুল আহদ’ও বলা হয়ে থাকে। ‘দারুল খাওফ’ বা ‘দারুল ফিতনা’ এমন কুফরি রাষ্ট্রকে বলা হয়, যেখানে মুসলমানদের পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা থাকে না এবং তথায় সে পরিপূর্ণ ইসলাম পালন করতে পারে না। আর এজন্যই এটাকে ‘দারুল খাওফ’ বা ভয়-কবলিত রাষ্ট্র ও ‘দারুল ফিতনা’ বা বিপদ-সংকুল রাষ্ট্র বলা হয়। যেমন চীন, উত্তর কোরিয়া, আমেরিকা, রাশিয়া ইত্যাদি। এ ধরনের দেশগুলোতে হাকিকি ও প্রকৃত মুসলিম তো দূরে থাকে, তাদের চিন্তা-চেতনা লালনকারী মডারেট মুসলিমরাও পুরোপুরি নিরাপদ নয়। আর ‘দারুল আমান’ এমন কুফরি রাষ্ট্রকে বলা হয়, যেখানে মুসলমানরা নিরাপদে চলাফেরা ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে এবং নিজেদের দীন পুরোপুরিভাবে মেনে চলতে পারে। আর এ কারণেই এটাকে ‘দারুল আমান’ বা নিরাপদ রাষ্ট্র বলা হয়। যেমন : ইসলামের শুরু যুগে হাবশা। ‘দারুল আহদ’ যদিও ‘দারুল আমান’-এর অন্তর্গত, কিন্তু উভয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, ‘দারুল আমান’ হলো আম বা ব্যাপক, আর ‘দারুল আহদ’ খাস বা বিশেষিত। কোনো ‘দারুল হারব’-এ মুসলমানদের পূর্ণ নিরাপত্তা থাকলেই সেটা ‘দারুল আমান’; চাই সে দেশের সাথে মুসলমানদের খলিফার কোনো চুক্তি থাকুক বা না থাকুক। শর্ত কেবল একটাই, পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা থাকেদ হবে, আংশিক হলে হবে না। কিন্তু ‘দারুল আহদ’ হওয়ার জন্য সে দেশের সাথে মুসলমানদের খলিফার নিরাপত্তাচুক্তি থাকা আবশ্যিক। যেমন : হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত মক্কা নগরী। এটা একইসাথে যেমন ‘দারুল আমান’, অনুরূপ এটা ‘দারুল আহদ’ও ছিল। পক্ষান্তরে হাবশা ‘দারুল আমান’ হলেও সেটা কিন্তু ‘দারুল আহদ’ ছিল না। সুতরাং সব ‘দারুল আহদ’-ই ‘দারুল আমান’ হয়, কিন্তু সব ‘দারুল আমান’-ই ‘দারুল আহদ’ হওয়া জরুরি নয়।

আল্লামা আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ রহ. বলেন :

ومن جهة أمن المسلم على نفسه فيها، تنقسم دار الكفر إلى:
أ— دار الأمن: وهي التي يأمن المسلم فيها على نفسه، مثل الحبشة
في صدر الإسلام لما هاجر إليها الصحابة فراراً من بطش كفار مكة.
ب — دار الفتنة: وهي التي لا يأمن المسلم فيها على نفسه، مثل مكة في
صدر الإسلام، ومثل معظم ديار الردة اليوم.

‘দারুল কুফরে মুসলমানের নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা আবার দু’প্রকার। এক. দারুল আমান। এটা ওই রাষ্ট্র, যেখানে মুসলমান নিজের জানের নিরাপত্তা পায়। যেমন ইসলামের শুরুযুগে হাবশা; যখন মক্কার কাফিরদের অত্যাচার থেকে পলায়ন করে কিছু সাহাবি তথায় হিজরত করেছিলেন। দুই. দারুল ফিতনা। এটা ওই রাষ্ট্র, যেখানে মুসলমান নিজের জানের নিরাপত্তা পায় না। যেমন ইসলামের শুরুযুগে মক্কা ও বর্তমান সময়ের অধিকাংশ দারুল রিদা (অর্থাৎ নামসর্বস্ব ইসলামি দেশ, যেগুলোকে মূলত ইসলামি না বলে মুসলিম দেশ বলা উচিত)।’ (আল-জামিউ ফি তালাবিল ইলম : ২/৬৪৬, প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ)

উল্লেখ্য যে, ফিকহের কিতাবগুলোতে ‘দারুল আমান’ বলতে ‘দারুল হারব’-এরই একটি প্রকার বুঝানো হলেও বর্তমানে কিছু মানুষ এটাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ‘দার’ হিসেবে দাবি করে থাকে। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল একটি দাবি, যা ফিকহের এসব অধ্যায়ের সাথে সামান্য সম্পর্ক রাখে, এমন যেকোনো তালিবুল ইলমের জানা থাকার কথা। বিষয়টি যেহেতু বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তাই এখানে সংক্ষেপে এটা নিয়ে সামান্য আলোচনা তুলে ধরিছি।

দারুল আমান ও তার হাকিকত

অধুনা সময়ের কিছু কিছু আলিমের মুখে শুনতে পাওয়া যায়, ‘দার’ তিন প্রকারের। এক. দারুল ইসলাম, দুই. দারুল হারব, তিন. দারুল আমান। এ প্রসঙ্গে আমরা দু’টি বিষয় নিয়ে কথা বলব। প্রথমত, ফুকাহায়ে কিরামের পরিভাষায় ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’ এ দু’টির বাইরে ‘দারুল আমান’ বলে তৃতীয় কোনো ‘দার’-এর অস্তিত্ব আছে কিনা। দ্বিতীয়ত, ‘দারুল আমান’ বলতে কী বুঝায় এবং এটার প্রকৃত অর্থ কী।

প্রথম কথা হলো, শরিয়তের পরিভাষায় ‘দার’-এর প্রকারভেদ দু’টিই। যথা : ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’। এখানে এ দু’টির বিপরীতে ‘দারুল আমান’ বলে তৃতীয় কোনো ‘দার’ নেই। মানুষ যেমন হয় মুমিন, নয় কাফির হবে, এখানে তৃতীয় কোনো প্রকার নেই; অনুরূপ দেশ হয় ‘দারুল ইসলাম’ হবে নয় ‘দারুল হারব’ হবে, এর তৃতীয় কোনো প্রকার নেই। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদামতে ইসলাম ও কুফরের মাঝে যেমন তৃতীয় কোনো স্তর নেই, ঠিক তেমনই ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-এর মাঝেও এমন তৃতীয় কোনো স্তর নেই, যা ‘দারুল ইসলাম’ও হবে না, আবার ‘দারুল হারব’ও হবে না। এ ব্যাপারে আমরা ফুকাহায়ে কিরামের উক্তিসমূহ তুলে ধরছি।

কাজি আবু ইয়ালা রহ. বলেন :

وَدَلِيلُنَا مَا تَقَدَّمَ فِي مَسَائِلِ الْإِيمَانِ وَأَنَّ سَائِرَ الْمُكَلَّفِينَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونُوا كُفَّارًا أَوْ مُؤْمِنِينَ كَامِلِي الْإِيمَانِ أَوْ نَاقِصِي الْإِيمَانِ أَوْ بَعْضُهُمْ كُفَّارًا وَبَعْضُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَلَا يَجُوزُ كَوْنُ مُكَلَّفٍ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَا كَافِرٍ كَذَلِكَ الدَّارُ أَيْضًا لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ دَارَ كُفْرٍ أَوْ دَارَ إِسْلَامٍ.

‘আর আমাদের দলিল হলো যা ইমানের মাসায়িলের আলোচনায় বিগত হয়েছে। আরেকটি দলিল হলো, সকল মুকাল্লাফ (শরিয়তের বিধান মানতে আদিষ্ট ব্যক্তি) দুই অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারবে না। হয় সবাই কাফির হবে, নয়তো সবাই মুমিন হবে; চাই পরিপূর্ণ ইমানের অধিকারী হোক বা অপরিপূর্ণ ইমানের অধিকারী হোক। অথবা কিছু লোক কাফির আর কিছু লোক মুমিন হবে। কিন্তু এমনটা হওয়ার কোনোই অবকাশ নেই যে, কোনো মুকাল্লাফ (শরিয়ত পালনে আদিষ্ট ব্যক্তি) মুমিনও হবে না আবার কাফিরও হবে না। ঠিক অনুরূপ “দার”ও দুই অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয় তা “দারুল কুফর” হবে নয়তো “দারুল ইসলাম” হবে।’ (আল-মু’তামাদ ফি উসুলিদ্দিন : পৃ. নং ২৭৬, প্রকাশনী : দারুল মাশরিক, বৈরুত)

ইমাম ইবনে মুফলিহ মাকদিসি রহ. বলেন :

فَكُلُّ دَارٍ غَلَبَ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ فَدَارُ الْإِسْلَامِ وَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْكُفَّارِ فَدَارُ الْكُفْرِ وَلَا دَارَ لَغَيْرِهِمَا

‘প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড, যেখানে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত, তা “দারুল ইসলাম”। আর যদি কোনো ভূখণ্ডে কুফরি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে তা “দারুল কুফর”। এ দু’প্রকারের বাইরে আর কোনো “দার” নেই।’ (আল-আদাবুশ শারইয়্যা ওয়াল মিনহুল মারইয়্যা : ১/১৯০, প্রকাশনী : আলামুল কুতুব, বৈরুত)

আল্লামা আব্দুল্লাহ আবু বাতিন রহ. বলেন :

قال الأصحاب: الدّار داران: دار إسلام ودار كفر، فدار الإسلام هي التي تجري أحكام الإسلام فيها وإن لم يكن أهلها مسلمين، وغيرها دار كفر،

‘আমাদের উলামায়ে কিরাম বলেন, দার হলো দুটি ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল কুফর’। ‘দারুল ইসলাম’ বলা হয়, যেখানে ইসলামের বিধিবিধান চলমান ও প্রতিষ্ঠিত আছে; যদিও তার অধিবাসীরা মুসলিম না হোক। আর এর বিপরীতটা (অর্থাৎ যেখানে কুফরি বিধিবিধান চলমান ও প্রতিষ্ঠিত, সেটা) হলো ‘দারুল কুফর’।’ (মাজমুআতুর রাসায়িলি ওয়াল মাসায়িলিন নাজদিয়া : ১/৬৫৫, প্রকাশনী : মাতবাতুল মানার, মিশর)

সাইয়িদ কুতুব শহিদ রহ. বলেন :

يَنْقَسِمُ الْعَالَمُ فِي نَظَرِ الْإِسْلَامِ وَفِي اعْتِبَارِ الْمُسْلِمِ إِلَى قِسْمَيْنِ اثْنَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا. الْأَوَّلُ: دَارُ الْإِسْلَامِ. وَتَشْمِلُ كُلَّ بَلَدٍ تُطَبَّقُ فِيهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ، وَتَحْكُمُهُ شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ... الثَّانِي: دَارُ الْحَرْبِ. وَتَشْمِلُ كُلَّ بَلَدٍ لَا تُطَبَّقُ فِيهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ، وَلَا يُحْكَمُ بِشَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ.

‘ইসলাম ও মুসলিমদের বিবেচনায় পুরো বিশ্ব দু’ভাগে বিভক্ত, যার তৃতীয় কোনো প্রকার নেই। প্রথম হলো “দারুল ইসলাম”। এটা প্রত্যেক এমন ভূখণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেখানে ইসলামি বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা হয় এবং ইসলামি শরিয়া অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করা হয়। ...দ্বিতীয় হলো “দারুল হারব”। এটা প্রত্যেক এমন ভূখণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেখানে ইসলামি বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা হয় না এবং ইসলামি শরিয়া অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করা হয় না।’ (ফি জিলালিল কুরআন : ২/৩৪৮, প্রকাশনী : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা)

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, শরিয়তে ‘দারুল আমান’ বা ‘দারুল আহদ’ নামে একটি পরিভাষা আছে, কিন্তু সেটা ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-এর বিপরীতে তৃতীয় কোনো প্রকার নয়; বরং তা ‘দারুল হারব’-এরই একটি প্রকার মাত্র। কেননা, ফুকাহায়ে কিরাম ‘দারুল হারব’-কে দু’ভাগে ভাগ করেছেন। একটি হলো, ওই ‘দারুল হারব’, যার রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে মুসলমানদের কোনো চুক্তি নেই এবং সেখানে মুসলমানরা নিরাপদও নয়। এটাকে বলা হয় ‘দারুল খাওফ’ বা ভীতির দেশ। দ্বিতীয় প্রকার হলো, ওই দারুল হারব, যার রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে মুসলমানদের খলিফার নিরাপত্তা-চুক্তি আছে, কিংবা যেখানে মুসলমানেরা পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে বসবাস করতে পারে। এটাকে ‘দারুল আমান’ বা ‘দারুল আহদ’ বা ‘দারুল মুওয়াদাআ’ তথা নিরাপত্তার দেশ বলা হয়।

এ ব্যাপারে বিশ্বের অন্যতম সেরা ফিকহি বোর্ড ‘মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি’ তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এভাবে তুলে ধরেছে :

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ دَارِ الْعَهْدِ وَدَارِ الْحَرْبِ إِلَّا مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْأُولىَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مُعَاهَدَةٌ سَلَامٍ، عَلَى حِينٍ لَا يُوجَدُ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ فَكَانَتْ دَارُ الْحَرْبِ يَتَوَقَّعُ مِنْهَا الْأَعْتِدَاءُ فِي أَيِّ وَقْتٍ، وَهُمَا عَدَا هَذَا دَارٌ وَاحِدَةٌ تُقَابِلُ دَارَ الْإِسْلَامِ، فَهُمَا لَا يَعْتَرِفَانِ بِهَذَا الدِّينِ، وَلَا عِبْرَةٌ بِمَا يَكُونُ مِنْ تَفَاوُتٍ فِي الْعَقَائِدِ بَيْنَ أَهْلِ دَارِ الْعَهْدِ وَدَارِ الْحَرْبِ، فَهَذَا لَا يُؤَثِّرُ فِي أَنَّهُمَا دَارٌ وَاحِدَةٌ غَيْرُ إِسْلَامِيَّةٍ.

‘বস্তুত “দারুল আমান” ও “দারুল হারব”-এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। শুধু এতটুকু যে, “দারুল আমান”-এর ক্ষেত্রে তাদের ও মুসলমানদের মাঝে শান্তিচুক্তি থাকে। কিন্তু “দারুল হারব”-এর ক্ষেত্রে এমন কোনো চুক্তি থাকে না। এর কারণে তাদের পক্ষ থেকে যেকোনো ধরনের সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কার ভিত্তিতে সেটাকে (“দারুল আমান” না বলে) “দারুল হারব” বলা হয়। এ পার্থক্য ছাড়া মূলত এ দু’টি (“দারুল হারব” ও “দারুল আমান”) একই, যা “দারুল ইসলাম”-এর বিপরীতে আসে। এ উভয় প্রকার রাষ্ট্রই দীন ইসলামকে স্বীকার করে না। আর “দারুল আমান” ও “দারুল হারব”-এর অধিবাসীদের মাঝে আকিদা ও

বিশ্বাসগত যে ব্যবধান আছে, তা তেমন বিবেচ্য নয়। উভয় প্রকারই অনৈসলামিক রাষ্ট্র হওয়ার ব্যাপারে এটা কোনো প্রভাব ফেলবে না।’ (মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামি : ৭/১৭১১, প্রকাশনী : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা)

ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান রহ. বলেন :

وَلَوْ أَنَّ الْمُؤَادَعِينَ لَمْ يَخْرُجُوا إِلَيْنَا حَتَّى أَغَارَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ دَارِ حَرْبٍ أُخْرَى فِي دَارِهِمْ فَأَسْرَوْا مَعَهُمْ أَسِيرًا ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ فَاسْتَنْقَذُوهُمْ مِنْ أَيْدِيهِمْ، كَانُوا عَبِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ مَا كَانُوا أَصَابُوهُمْ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّ دَارَ الْمُؤَادَعِينَ دَارَ الْحَرْبِ، لَا يَجْرِي فِيهَا حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ.

‘যদি চুক্তিবদ্ধ কাফিররা আমাদের নিকট না এসে থাকে (বরং তাদের দেশেই অবস্থান করে); ইতিমধ্যে অন্য কোনো “দারুল হারব”-এর কাফিররা তাদের দেশে আকস্মিক আক্রমণ করে তাদের লোকদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায়, অতঃপর মুসলিমরা ওই আক্রমণকারী কাফিরদের (সাথে যুদ্ধ করে তাদের) ওপর বিজয় অর্জন করে এবং ওই সব বন্দীদের মুক্ত করে আনে, তাহলে এসব বন্দী মুসলমানদের দাস হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা, মুসলমানেরা তো “দারুল ইসলাম” থেকে তাদের বন্দী করে আনে। যেহেতু চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের দেশ তো (প্রকৃত অর্থে) “দারুল হারব”, যেখানে মুসলমানদের শাসন কার্যকর নয়।’ (আস-সিয়ারুল কাবির মাআ শারহিস সারাখসি : ৫/১৮৯৩, প্রকাশনী : আশ-শিরকাতুশ শারকিয়া)

এ বর্ণনা থেকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রমাণ হয় যে, ‘দারুল আমান’ বা চুক্তিবদ্ধ কাফির রাষ্ট্র আলাদা কোনো প্রকার নয়; বরং সেটাও ‘দারুল হারব’-এরই অন্তর্ভুক্ত। আমরা পূর্বে বলে এসেছি যে, ‘দারুল হারব’ মূলত দু’প্রকারের। এক. ‘দারুল খাওফ’ বা ভীতির দেশ। অর্থাৎ কাফির-শাসিত যে রাষ্ট্রের সাথে মুসলমানদের নিরাপত্তাচুক্তি নেই, পাশাপাশি মুসলমানরা সেখানে নিরাপদও নয়। এটা হলো ‘দারুল হারব’-এর প্রথম প্রকার ‘দারুল খাওফ’। দুই. ‘দারুল আমান’ বা নিরাপত্তার দেশ। অর্থাৎ কাফির-শাসিত যে রাষ্ট্রের সাথে মুসলমানদের নিরাপত্তাচুক্তি আছে, বা যেখানে মুসলমানরা পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারে। এটা হলো ‘দারুল হারব’-এর দ্বিতীয় প্রকার ‘দারুল আমান’। অতএব,

যারা ‘দারুল আমান’-কে ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-এর বিপরীতে তৃতীয় একটি প্রকার বলে প্রচার করে, তারা অজ্ঞতাবশত বা ভুল বুঝে এমনটা বলে থাকে, যার সাথে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই।

চতুর্থ অধ্যায় :

দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের রূপান্তর

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ‘দারুল হারব’ কখন ‘দারুল ইসলাম’-এ পরিণত হয় এবং ‘দারুল ইসলাম’ কখন ‘দারুল হারব’-এ পরিণত হয়, তা জানা। এ দুটির মধ্যে একটি মাসআলা মুত্তাফাক আলাইহি বা ঐকমত্যপূর্ণ। আরেকটি মাসআলা কিছুটা মুখতালাফ ফিহ বা মতানৈক্যপূর্ণ। ঐকমত্যপূর্ণ মাসআলাটি হলো, কোনো ‘দারুল হারব’ মুসলমানদের হাতে আসার পর তাতে ইসলামি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করলেই তা ‘দারুল ইসলাম’ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে ফকিহদের মাঝে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো মতানৈক্য নেই। কিন্তু ‘দারুল ইসলাম’ কখন ‘দারুল হারব’ হবে, সে ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ আছে।

‘দারুল ইসলাম’ কখন ‘দারুল হারব’ হবে, সে ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য তিনটি মত পাওয়া যায়। এক : ইমাম মালিক রহ., ইমাম আহমাদ রহ., ইমাম আবু ইউসুফ রহ., ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-সহ অধিকাংশ ফকিহের নিকট ‘দারুল ইসলাম’-এ কুফরি শাসনব্যবস্থা ও সংবিধান চালু হলেই তা ‘দারুল হারব’-এ পরিণত হয়ে যায়। দুই : ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মতে কোনো ভূখণ্ড একবার ‘দারুল ইসলাম’ হয়ে গেলে তা আর কখনো ‘দারুল হারব’ হবে না; যদিও তথায় কুফরি আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন : ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর নিকটে ‘দারুল ইসলাম’ ‘দারুল হারব’-এ পরিণত হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। এক. সে দেশে কুফরি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। দুই. রাষ্ট্রটি পার্শ্ববর্তী অন্য আরেকটি ‘দারুল হারব’-এর সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে। তিন. ‘দারুল ইসলাম’ থাকাবস্থায় জনগণের যে নিরাপত্তাব্যবস্থা ও চুক্তি ছিল তা কার্যকর থাকবে না; বরং তাদের নিরাপত্তার জন্য নতুন করে চুক্তি ও শর্ত ঠিক করে নেওয়ার প্রয়োজন হবে। এই তিনটি শর্ত যদি একসাথে পাওয়া যায়, তাহলেই কেবল কোনো ‘দারুল ইসলাম’ ‘দারুল হারব’-এ পরিণত হবে। দেখুন- আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া : ২০/২০২, প্রকাশনী : অজারাতুল আওকাফ ওয়াশ শূয়ুনিল ইসলামিয়া, কুয়েত।

এ ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মতটি নিতান্তই মারজুহ ও দুর্বল, যার কারণে অনেক সময় দেখা যায়, এ ইখতিলাফের আলোচনায় তাঁর মতটি উল্লেখ না করে শুধু প্রথম আর তৃতীয় মতটিই উল্লেখ করা হয়। তাই আমরাও এখানে ইমাম

শাফিয়ি রহ.-এর মত নিয়ে আলোচনা না করে শুধু জমহুরে ফুকাহা ও ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মত নিয়ে আলোচনা করব। নিম্নে আমরা এ দু'মতের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের ভাষ্য ও উভয় পক্ষের দলিলাদি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করছি।

ইমাম কাসানি রহ. বলেন :

لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ دَارَ الْكُفْرِ تَصِيرُ دَارَ إِسْلَامٍ بِظُهُورِ أَحْكَامِ
الْإِسْلَامِ فِيهَا وَاخْتَلَفُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، إِنَّهَا بِمَاذَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ؟ قَالَ أَبُو
حَنِيفَةَ: إِنَّهَا لَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ إِلَّا بِثَلَاثِ شَرَائِطٍ، أَحَدُهَا: ظُهُورُ أَحْكَامِ
الْكُفْرِ فِيهَا وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ مُتَاخِمَةً لِدَارِ الْكُفْرِ وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يَبْقَى
فِيهَا مُسْلِمٌ وَلَا ذِمِّيٌّ أَمِنًا بِالْأَمَانِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ أَمَانُ الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ
وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ: إِنَّهَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا.

‘আমাদের ফকিহদের মাঝে এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, “দারুল হারব”-এ ইসলামি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই তা “দারুল ইসলাম”-এ পরিণত হয়ে যায়। তবে তাঁরা “দারুল ইসলাম”-এর ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন যে, তা কখন “দারুল হারব”-এ পরিণত হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে তবেই “দারুল ইসলাম” “দারুল হারব”-এ পরিণত হবে। এক. তথায় কুফরি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়া। দুই. (পার্শ্ববর্তী অন্য) কোনো “দারুল হারব”-এর সাথে সংযুক্ত থাকা। তিন. মুসলমানদের (খলিফার) পক্ষ থেকে প্রদত্ত পূর্বের নিরাপত্তাচুক্তি অনুসারে কোনো মুসলমান বা জিম্মি থাকতে না পারা। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেছেন, “দারুল ইসলাম”-এ কুফরি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই তা “দারুল হারব”-এ পরিণত হয়ে যাবে।’ (বাদায়িউস সানায়ি : ৭/১৩০, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলামিয়া, বৈরুত)

ইমাম কাসানি রহ. সাহিবাইনের পক্ষ থেকে দলিল দিয়ে বলেন :

وَجَهٌ قَوْلُهُمَا أَنَّ قَوْلَنَا دَارُ الْإِسْلَامِ وَدَارُ الْكُفْرِ إِصَافَةٌ دَارٍ إِلَى الْإِسْلَامِ وَإِلَى
الْكُفْرِ، وَإِنَّمَا تُصَافُ الدَّارُ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوْ إِلَى الْكُفْرِ لظُهُورِ الْإِسْلَامِ أَوْ

الْكُفْرِ فِيهَا، كَمَا تُسَمَّى الْجَنَّةُ دَارَ السَّلَامِ، وَالتَّارُ دَارَ الْبَوَارِ؛ لُجُودِ السَّلَامَةِ فِي الْجَنَّةِ، وَالتَّارِ فِي الْبَوَارِ وَظُهُورُ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ بِظُهُورِ أَحْكَامِهِمَا، فَإِذَا ظَهَرَ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِي دَارٍ فَقَدْ صَارَتْ دَارُ كُفْرٍ فَصَحَّتِ الْإِضَافَةُ، وَلِهَذَا صَارَتْ الدَّارُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ شَرِيطَةٍ أُخْرَى، فَكَذَا تَصِيرُ دَارُ الْكُفْرِ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا.

‘ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর মতের পক্ষে দলিল হলো, আমাদের “দারুল ইসলাম” ও “দারুল কুফর” কথা দু’টিতে “দার”-কে ইসলাম ও কুফরের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আর “দার”-কে ইসলাম ও কুফরের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয় তাতে ইসলাম কিংবা কুফর প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে। যেমন : জান্নাতকে “দারুস সালাম” ও জাহান্নামকে “দারুল বাওয়ার” বলা হয়ে থাকে; যেহেতু জান্নাতে “সালাম” বা শান্তি রয়েছে আর জাহান্নামে “বাওয়ার” বা ধ্বংস রয়েছে। আর ইসলাম ও কুফর প্রতিষ্ঠিত হয় তার আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা। অতএব, যখন কোনো ভূখণ্ডে কুফরি আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন তা “দারুল কুফর” হয়ে যাবে। তাই “দার”-কে এভাবে ইসলাম কিংবা কুফরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করাটা সঠিক। এজন্য ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা লাভের দ্বারাই কোনো ভূখণ্ড “দারুল ইসলাম” হিসেবে গণ্য হয়। এই একটি মাত্র শর্ত ছাড়া এখানে আর কোনো শর্ত নেই। অনুরূপ কুফরি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই “দারুল ইসলাম” “দারুল কুফর”-এ রূপান্তরিত হয়।’ (বাদায়িউস সানায়ি : ৭/১৩০-১৩১, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

ইমাম কাসানি রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর পক্ষ থেকে দলিল দিয়ে বলেন :

وَجْهٌ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ إِضَافَةِ الدَّارِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ لَيْسَ هُوَ عَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ هُوَ الْأَمْنُ وَالْخَوْفُ. وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْأَمَانَ إِنْ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَالْخَوْفُ لِلْكَفَرَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، فَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ كَانَ الْأَمَانُ فِيهَا لِلْكَفَرَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَالْخَوْفُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، فَهِيَ دَارُ الْكُفْرِ وَالْأَحْكَامُ

مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَمَانِ وَالْخَوْفِ لَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ، فَكَانَ اعْتِبَارُ الْأَمَانِ وَالْخَوْفِ أَوَّلَى، فَمَا لَمْ تَقَعْ الْحَاجَةُ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَى الْإِسْتِثْمَانِ بَقِي الْأَمْنُ الثَّابِتُ فِيهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ، فَلَا تَصِيرُ دَارُ الْكُفْرِ، وَكَذَا الْأَمْنُ الثَّابِتُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَا يَزُولُ إِلَّا بِالْمُتَاخَمَةِ لِدَارِ الْحَرْبِ، فَتَوَقَّفَ صَيْرُورُهَا دَارَ الْحَرْبِ عَلَى وُجُودِهَا مَعَ أَنَّ إِصَافَةَ الدَّارِ إِلَى الْإِسْلَامِ احْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِمَا قُلْتُمْ، وَاحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِمَا قُلْنَا، وَهُوَ ثُبُوتُ الْأَمْنِ فِيهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْكَفَرَةِ بِعَارِضِ الذِّمَّةِ وَالْإِسْتِثْمَانِ، فَإِنْ كَانَتْ الْإِصَافَةُ لِمَا قُلْتُمْ تَصِيرُ دَارُ الْكُفْرِ بِمَا قُلْتُمْ. وَإِنْ كَانَتْ الْإِصَافَةُ لِمَا قُلْنَا لَا تَصِيرُ دَارُ الْكُفْرِ إِلَّا بِمَا قُلْنَا، فَلَا تَصِيرُ مَا بِهِ دَارُ الْإِسْلَامِ بَيِّقِينَ دَارَ الْكُفْرِ بِالشَّكِّ وَالْإِحْتِمَالِ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ أَنَّ الثَّابِتَ بَيِّقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ وَالْإِحْتِمَالِ، بِخِلَافِ دَارِ الْكُفْرِ حَيْثُ تَصِيرُ دَارُ الْإِسْلَامِ؛ لظُهُورِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا؛ لِأَنَّ هُنَاكَ التَّرْجِيحَ لِنَاحِيَةِ الْإِسْلَامِ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى فَزَالَ الشَّكُّ عَلَى أَنَّ الْإِصَافَةَ إِنْ كَانَتْ بِاعْتِبَارِ ظُهُورِ الْأَحْكَامِ، لَكِنْ لَا تَظْهَرُ أَحْكَامُ الْكُفْرِ إِلَّا عِنْدَ وُجُودِ هَدَيْنِ الشَّرْطَيْنِ - أَعْنِي الْمُتَاخَمَةَ وَزَوَالَ الْأَمَانِ الْأَوَّلِ - لِأَنَّهَا لَا تَظْهَرُ إِلَّا بِالْمَنْعَةِ، وَلَا مَنَعَةٍ إِلَّا بِهِمَا وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

‘ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বক্তব্যের কারণ হলো, “দার”-কে ইসলাম ও কুফরের সঙ্গে সম্পর্কিত করার দ্বারা আসলে তো ইসলাম কিংবা কুফরের হাকিকত উদ্দেশ্য নয়। (কেননা, “দার” বা ভূখণ্ড তো আর মুসলমান বা কাফির হয় না)। উদ্দেশ্য হলো আমান (নিরাপত্তা) ও খাওফ (ভীতি)। এর অর্থ হলো, যদি সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য আমান (নিরাপত্তা) থাকে, আর কাফিরদের জন্য স্বাভাবিকভাবে খাওফ (ভীতি) থাকে (এমনভাবে যে, পূর্ণ নিরাপত্তা পেতে হলে তাদের আলাদা চুক্তি করার প্রয়োজন হয়), তাহলে তা “দারুল ইসলাম”। আর যদি সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য খাওফ (ভীতি) থাকে আর কাফিরদের জন্য স্বাভাবিকভাবে থাকে আমান (নিরাপত্তা), তাহলে তা হবে “দারুল কুফর”।

হুকুমের ভিত্তি হলো আমান ও খাওফের ওপর; বাস্তবিক ইসলাম ও কুফরের ওপর নয়। তাই আমান ও খাওফকেই বিবেচনায় নেওয়া উত্তম। তো যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করতে হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সাধারণভাবে আমান বহাল রয়েছে ধরা হবে। তাই তা “দারুল কুফর”-এ পরিণত হবে না। তেমনিভাবে সাধারণ নিরাপত্তা তখনই বিনষ্ট হওয়া সম্ভব, যখন সে অঞ্চলটা “দারুল হারব” সংলগ্ন হবে। তাহলে “দারুল ইসলাম” “দারুল হারব”-এ পরিণত হওয়ার জন্য দুটো বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এক. আমান (নিরাপত্তা) নষ্ট হওয়া। দুই. “দারুল হারব” সংলগ্ন অঞ্চল হওয়া। “দার”-কে ইসলামের দিকে নিসবত করার হেতু সেটাও হতে পারে, যা সাহিবাইন বলেছেন, আবার তা-ও হতে পারে, যা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর পক্ষে আমরা বলছি। অর্থাৎ সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য নিরাপত্তা সাব্যস্ত থাকা। কাফিরদের জন্য নিরাপত্তা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য আলাদা জিম্মাচুক্তি কিংবা ইসতিমান বা নিরাপত্তাচুক্তি প্রয়োজন। “দার”-কে ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত করার হেতু যদি তা হয়, যা সাহিবাইন বলেছেন, তাহলে কোনো অঞ্চল “দারুল কুফর” হিসেবে গণ্য হবে সে কারণেই, যা তারা উল্লেখ করেছেন। আর যদি এই সম্পর্কিতকরণের হেতু তা হয়, যা আমরা বলেছি, তাহলে দেশ তখনই “দারুল হারব” হিসেবে গণ্য হবে, যখন আমাদের বর্ণিত শর্তগুলো পাওয়া যাবে। সুতরাং নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত “দারুল ইসলাম” শুধু সন্দেহ-সম্ভাবনার কারণে “দারুল কুফর”-এ পরিণত হবে না। কারণ, এ মূলনীতি স্বীকৃত যে, “যা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত, তা সন্দেহ-সম্ভাবনার কারণে বিদূরীত হয় না।” কিন্তু “দারুল হারব”-এর বিষয়টি ভিন্ন। যেহেতু (আমরা জানি,) “দারুল হারব”-এ ইসলামি আইন ও শাসনব্যবস্থা চালু হলেই তা “দারুল ইসলাম”-এ পরিণত হয়ে যায়। এর কারণ হলো, এখানে ইসলামের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয় রয়েছে। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “ইসলাম (সর্বদা) বিজয়ী থাকবে, পরাজিত নয়।” অতএব, সকল সংশয় নিরসন হয়ে গেল। এছাড়াও (ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর পক্ষ থেকে) বলা যায় যে, (ইসলাম বা কুফরের সাথে) “দার”-এর সম্পৃক্ততা যদি শুধু আইন ও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিবেচনায়ও হয়, তবুও উপরিউক্ত দু’শর্ত দারুল হারবের সংলগ্ন হওয়া ও পূর্বের নিরাপত্তাচুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়া না থাকলে কুফরি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা হওয়া সাব্যস্ত হয় না। কেননা, সামরিক বাহিনী ছাড়া (তাদের কুফরি আইন ও শাসনব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠা হওয়ার

কথা কল্পনা করা যায় না। আর সামরিক বাহিনী পূর্বের দু’শতের উপস্থিতি ছাড়া সম্ভব নয়।’ (বাদায়িউস সানায়ি : ৭/১৩০-১৩১, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সবার এক্যমতে ‘দারুল হারব’-এ ইসলামি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা ও চালু হয়ে গেলেই তা ‘দারুল ইসলাম’-এ পরিণত হয়ে যায়। তবে ‘দারুল ইসলাম’-এ কুফরি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা পাওয়ার দ্বারা সেটা ‘দারুল হারব’-এ পরিণত হওয়ার মাসআলায় কিছুটা মতনৈক্য পাওয়া যায়। এ মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ. একদিকে, আর এর বিপরীতে তাঁর দুই প্রধান শাগরিদ ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এবং পাশাপাশি ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম আহমাদ রহ.-সহ অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরাম আরেকদিকে। অধিকাংশ ইমাম ও ফকিহ এতে শুধু কুফুরি আইন ও শাসন চালু হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেন। আর ইমাম আবু হানিফা রহ. মনে করেন, শুধু এতটুকু হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং এখানে মূল দেখার বিষয় হলো, এখানে কারা নিরাপত্তায় থাকতে পারছে আর কাদের ভয় ও আতঙ্কে থাকতে হচ্ছে।

সুতরাং কোনো ‘দারুল ইসলাম’-এর শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে বা অন্য কোনো কাফির শাসক মুসলমানদের উদাসীনতায় ‘দারুল ইসলাম’-এর কোনো ভূখণ্ড দখল করে তথায় কুফরি আইন ও শাসনব্যবস্থা চালু করলেও তা ‘দারুল হারব’ হবে না, যতক্ষণ না এ প্রতিষ্ঠা শক্তিশালী ও সুদৃঢ় বলে প্রমাণিত হয়। আর এর জন্য দু’টি বিষয় লাগবে। এক. এ রাষ্ট্রটির সীমান্ত অন্য কোনো ‘দারুল হারব’-এর সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে। কেননা, রাষ্ট্রটির চারপাশে যদি ‘দারুল ইসলাম’-ই থাকে, তাহলে এ মধ্যবর্তী রাষ্ট্রে কাফিরদের প্রভাব ও অবস্থান শক্তিশালী হবে না। চারপাশ থেকে কাফিরদের সর্বদা এ আতঙ্কে থাকতে হবে যে, না জানি কখন ‘দারুল ইসলাম’ থেকে মুসলিম বাহিনী এসে তাদের দেশ আক্রমণ করে বসে। দুই. ‘দারুল ইসলাম’ থাকাবস্থায় মুসলিম শাসক কর্তৃক জনগণকে যে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল, তা বাতিল করে দিতে হবে। কেননা, কাফির শাসক যদি ‘দারুল ইসলাম’-এর পূর্বের দেওয়া নিরাপত্তাচুক্তি বাতিল করতে না পারে, তাহলে বুঝা যাবে, তার শক্তি ও সাহস দুর্বল। আর এমন দুর্বল অবস্থানের ভিত্তিতে কোনো ‘দারুল ইসলাম’-কে ‘দারুল হারব’ ঘোষণা দেওয়া ইসলামকে ছোট করার নামান্তর। তাই এ দু’শর্ত বা দু’শর্তের কোনোটি পাওয়া না গেলে সেখানে

কাফিরদের অবস্থান শক্তিশালী ও প্রভাবপূর্ণ বলে প্রমাণিত না হওয়ায় সেটা ‘দারুল হারব’-এ পরিণত হবে না।

বাকি থেকে যায় এ সংশয় যে, যদি ‘দারুল ইসলাম’ ‘দারুল হারব’-এ পরিণত হওয়ার জন্য তিনটি শর্তের দরকার হয়, তাহলে তো ‘দারুল হারব’ ‘দারুল ইসলাম’-এ পরিণত হওয়ার জন্যও তিনটি শর্ত দরকার। এর উত্তরে ইমাম কাসানি রহ. বলেন, ‘দারুল হারব’-এর বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, এখানে আরেকটি মূলনীতি কাজ করেছে। সেটা হলো, কোথাও ইসলাম ও কুফরের মাঝে প্রাধান্যের ব্যাপার আসলে সেখানে ইসলামের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া নিয়ম। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসলাম (সর্বদা) বিজয়ী থাকবে, পরাজিত নয়। অতএব, এতে এ সংশয় নিরসন হয়ে যায়। তিনি আরেকটি জবাব দিয়েছেন এ বলে যে, ইসলাম বা কুফরের সাথে ‘দার’-এর সম্পৃক্ততা যদি শুধু আইন ও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিবেচনায়ও হয়, অর্থাৎ কুফরি শাসনব্যবস্থা থাকলে ‘দারুল হারব’ আর ইসলামি শাসনব্যবস্থা থাকলে ‘দারুল ইসলাম’ বলে মেনেও নেওয়া হয়, তবুও উপরিউক্ত দু’শর্ত (তথা ‘দারুল হারব’-এর সংলগ্ন হওয়া ও পূর্বের নিরাপত্তাচুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়া) না থাকলে কুফরি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা হওয়া সাব্যস্ত হয় না। কেননা, কাফিরদের সামরিক বাহিনী ছাড়া তাদের কুফরি আইন ও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা কল্পনা করা যায় না। আর সামরিক বাহিনীর অস্তিত্ব পূর্বের দু’শর্তের উপস্থিতি ছাড়া সম্ভব নয়।

ইমাম সারাখসি রহ. তাঁর মাসুতে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দলিলের মূলের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন যে, মূলত কোনো দেশে শক্তি ও প্রভাবের ভিত্তিতেই ‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’ নির্ণীত হয়। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. মনে করেন, তিনটি শর্তের উপস্থিতি ছাড়া কাফিরদের শক্তি ও প্রভাব পূর্ণতা পায় না, এজন্যই তিনটি শর্ত করা হয়েছে। আর অন্য ইমামগণ মনে করেন, কোনো দেশে কুফরি শাসনব্যবস্থা ও আইন প্রতিষ্ঠা হওয়ায়-ই প্রমাণ করে যে, সেখানে কুফর প্রতিষ্ঠিত; অতএব সেটা ‘দারুল হারব’ হবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতভিন্নতা ও তাঁর দলিলের উৎসের ব্যাপারে ইমাম সারাখসি রহ. বলেন :

وَلَكِنْ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَعْتَبِرُ تَمَامَ الْقَهْرِ وَالْقُوَّةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ

الْبَلَدَ كَانَتْ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ مُحَرَّرَةً لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يَبْطُلُ ذَلِكَ الْإِحْرَارُ إِلَّا بِتَمَامِ الْقَهْرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَذَلِكَ بِاسْتِجْمَاعِ الشَّرَائِطِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِالشَّرِكِ فَأَهْلُهَا مَقْهُورُونَ بِإِحَاطَةِ الْمُسْلِمِينَ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، فَكَذَلِكَ إِنْ بَقِيَ فِيهَا مُسْلِمٌ أَوْ ذِيٌّ آمِنٌ فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَدَمِ تَمَامِ الْقَهْرِ مِنْهُمْ، وَهُوَ نَظِيرٌ مَا لَوْ أَخَذُوا مَالَ الْمُسْلِمِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَمْلِكُونَهُ قَبْلَ الْإِحْرَارِ بِدَارِهِمْ لِعَدَمِ تَمَامِ الْقَهْرِ، ثُمَّ مَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ آثَارِ الْأَصْلِ فَالْحُكْمُ لَهُ دُونَ الْعَارِضِ كَالْمَحَلَّةِ إِذَا بَقِيَ فِيهَا وَاحِدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْخِطَّةِ فَالْحُكْمُ لَهُ دُونَ السُّكَّانِ وَالْمُسْتَرِينَ. وَهَذِهِ الدَّارُ كَانَتْ دَارَ إِسْلَامٍ فِي الْأَصْلِ فَإِذَا بَقِيَ فِيهَا مُسْلِمٌ أَوْ ذِيٌّ فَقَدْ بَقِيَ أَثَرٌ مِنْ آثَارِ الْأَصْلِ فَيَبْقَى ذَلِكَ الْحُكْمُ، وَهَذَا أَصْلٌ لِأَيِّ حَنِيفَةٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -... وَكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ مَوْضِعٍ مُعْتَبَرٍ بِمَا حَوْلَهُ فَإِذَا كَانَ مَا حَوْلَ هَذِهِ الْبَلَدَةِ كُلُّهُ دَارَ إِسْلَامٍ لَا يُعْطَى لَهَا حُكْمُ دَارِ الْحَرْبِ كَمَا لَوْ لَمْ يَظْهَرْ حُكْمُ الشَّرِكِ فِيهَا، وَإِنَّمَا اسْتَوَلَى الْمُرْتَدُّونَ عَلَيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ.

‘কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. বিবেচনায় নিয়েছেন বল ও শক্তির পূর্ণতা। কেননা এই শহর ইতিপূর্বে মুসলমানদের রক্ষণকারী হিসেবে ‘দারুল ইসলাম’-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব, সেই ইহরাজ (রক্ষণশক্তি) মুশরিকদের পূর্ণ প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমেই বিদূরিত হতে পারে। আর তা এই তিন শর্ত সম্মিলিতভাবে পাওয়া গেলেই কেবল সম্ভব। কেননা, যখন তা ‘দারুল হারব’ সংলগ্ন হবে না, তখন চারদিক থেকে মুসলমানদের বেষ্টিত মধ্য থেকে তার অধিবাসীরা পরাভূত থাকবে। তেমনই সেখানে মুসলমান ও জিম্মি যদি (পূর্বের নিরাপত্তার অধীনেই) নিরাপদ থাকে, তবে তা মুশরিকদের পূর্ণ প্রতাপ না থাকার প্রমাণ। এর দৃষ্টান্ত হলো এ মাসআলা যে, হারবিরা যদি ‘দারুল ইসলাম’-এ অবস্থানরত কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করে, তবে তাদের নিজেদের দেশে সংরক্ষণ করার পূর্ব পর্যন্ত তারা সেই সম্পদের মালিক হয় না; যেহেতু এখানে তার পূর্ণ প্রতাপ নেই। যতক্ষণ মূলের নিদর্শনসমূহের একটিও বাকি থাকবে, ততক্ষণ মূলের জন্যই হুকুম প্রযোজ্য হবে, আপতিত বিষয়ের জন্য নয়।

যেমন কোনো মহল্লা, যতক্ষণ তথায় একজন জমির মালিকও থাকবে ততক্ষণ তার মালিকানা ও কর্তৃত্বই বহাল থাকবে, নতুন আবাসগ্রহণকারী বা ক্রেতাদের নয়। এই ভূখণ্ড তো মূলত ‘দারুল ইসলাম’-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই যতক্ষণ তাতে কোনো মুসলিম কিংবা জিম্মি (পূর্বের নিরাপত্তার অধীনে নিরাপদ) থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মূলের নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে একটি নিদর্শন তো বাকি থেকেই যাচ্ছে। সুতরাং সেই (পূর্বের) হুকুম (অর্থাৎ ‘দারুল ইসলাম’ বহাল থাকা এবং সেটা ‘দারুল হারব’-এ পরিণত না হওয়া) বাকি থাকবে। এটা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর একটি মূলনীতি। ...তেননিই প্রত্যেক জায়গার হুকুমের ক্ষেত্রে তার আশপাশের জায়গার অবস্থা বিবেচ্য। সুতরাং যখন এই ভূখণ্ডের চারদিকে ‘দারুল ইসলাম’ থাকবে, তখন এই ভূখণ্ডের ওপর ‘দারুল হারব’-এর বিধান আরোপিত হবে না; যেমনিভাবে সেখানে শিরকি বিধান প্রতিষ্ঠিত না হলে তা আরোপ করা হতো না। মুরতাদরা দিনের সামান্য সময়ের জন্য এর ওপর দখল নিয়েছে মাত্র (যার শক্তিশালী কোনো ভিত্তি ও সুদৃঢ় কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নেই)।’ (আল-মাবসুত, সারাখসি : ১০/১১৪, প্রকাশনী : দারুল মারিফা, বৈরুত)

সার্বিক আলোচনার পর আমাদের দেখার বিষয় হলো, এখানে কোন মতটি অধিক শক্তিশালী। তো সবার দলিল ও যুক্তি সামনে রাখলে স্পষ্ট হয় যে, এ মাসআলায় জমহুর তথা অধিকাংশ ফকিহের মতই অধিক শক্তিশালী। কেননা, কোনো ভূখণ্ড ‘দারুল ইসলাম’ বা ‘দারুল হারব’ হওয়ার বিষয়টি এসেছে মূলত আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন ও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা থাকা বা না-থাকার ওপর ভিত্তি করে। অতএব, কোনো ‘দারুল হারব’ মুসলমানদের হাতে আসার পর তথায় আল্লাহর দীন ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা হলে সেটা যে ‘দারুল ইসলাম’ হবে, তাতে কোনো সন্দেহ বা ইখতিলাফ নেই। অনুরূপ কোনো ‘দারুল ইসলাম’ কাফিররা দখল করে নেওয়ার পর তথায় কুফরি ও অনৈসলামিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলে সেটাও ‘দারুল হারব’ হয়ে যাবে।

এজন্যই প্রখ্যাত হানাফি ফকিহ আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরি রহ. তাতারদের দখলকৃত ‘দারুল ইসলাম’-এর রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারে সাহিবাইনের মতানুসারে ‘দারুল হারব’ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন; অথচ সেসব রাষ্ট্রের অনেক এমন ছিল যে, তার চারপাশে সংযুক্ত কোনো ‘দারুল হারব’ ছিল না। তিনি বলেন :

وَفِي زَمَانِنَا بَعْدَ فِتْنَةِ التَّوَلَّى الْعَامَّةِ صَارَتْ هَذِهِ الْوَلَايَاتُ الَّتِي غَلَبُوا عَلَيْهَا
وَأَجْرُوا أَحْكَامَهُمْ فِيهَا كَحُورِزْمَ وَمَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَخُرَاسَانَ وَنَحْوَهَا صَارَتْ
دَارَ الْحَرْبِ فِي الظَّاهِرِ

‘আর আমাদের সময়ে তাতারিদের ব্যাপক ফিতনার পর খুওয়ারিজম, মা-
ওরাউনহা, খুরাসানসহ এ ধরনের যেসব অঞ্চলে তারা বিজয়ী হয়েছে এবং
তথায় তাদের কুফরি বিধিবিধান চালু করেছে, জাহিরুর রিওয়াযাত অনুসারে সব
‘দারুল হারব’-এ পরিণত হয়ে গিয়েছে।’ (আল-বাহরুর রায়িক : ৩/২৩০-
২৩১, প্রকাশনী : দারুল কিতাবিল ইসলামি, বৈরুত)

হানাফি মাজহাবের বিখ্যাত ফকিহ ইমাম জাসসাস রহ. শারহ মুখতাসারিত
তাহাবি-তে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ফতোয়াকে তাঁর যুগের জন্য সাব্যস্ত
করে সাহিবাইনের মতকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন :

وَالَّذِي أَظُنُّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ الَّتِي كَانَتْ فِي
زَمَانِهِ مِنْ جِهَادِ الْمُسْلِمِينَ أَهْلَ الشَّرْكِ، فَاِمْتَنَعَ عِنْدَهُ أَنْ تَكُونَ دَارَ حَرْبٍ
فِي وَسْطِ دَارِ الْمُسْلِمِينَ، يَرْتَدُّ أَهْلُهَا فَيَبْقُونَ مُمْتَنِعِينَ دُونَ إِحَاطَةِ الْجُيُوشِ
بِهِمْ مِنْ جِهَةِ السُّلْطَانِ، وَمُطَوَّعَةِ الرَّعِيَّةِ. فَأَمَّا لَوْ شَاهَدَ مَا قَدْ حَدَّثَ فِي هَذَا
الزَّمَانِ، مِنْ تَقَاعُدِ النَّاسِ عَنِ الْجِهَادِ، وَتَحَاذُلِهِمْ، وَفَسَادٍ مَنْ يَتَوَلَّى أُمُورَهُمْ،
وَعَدَاوَتِهِ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَاسْتِهَانَتِهِ بِأَمْرِ الْجِهَادِ، وَمَا يَجِبُ فِيهِ، لَقَالَ فِي
مِثْلِ بَلَدِ الْقَرْمَطِيِّ بِمِثْلِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، بَلْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبُلْدَانِ
الَّتِي هَذِهِ سَبِيلُهَا.

‘আর আমি যেটা মনে করি, ইমাম আবু হানিফা রহ. এসব শর্তের কথা বলেছিলেন
তাঁর সময়কার অবস্থার দিকে তাকিয়ে, যখন মুসলমানরা মুশরিকদের সাথে জিহাদ
করত। এজন্য তাঁর নিকট এটা অসম্ভব মনে হয়েছে যে, চারপাশে দারুল ইসলাম
থাকা সত্ত্বেও মাঝে একটি দারুল হারব থাকবে, তার অধিবাসীরা সবাই মুরতাদ
হয়ে যাবে; অথচ মুসলিম শাসকের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক মুসলিম
জনগণ এসে তাদেরকে অবরুদ্ধ না করে নিবৃত্ত থাকবে! কিন্তু তিনি যদি আজকের

অবস্থা অবলোকন করতেন, যখন লোকেরা জিহাদ করার ব্যাপারে বিমুখতা প্রদর্শন ও শিথিলতা দেখাচ্ছে, শাসকরা দুর্নীতি করছে, ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা রাখছে, জিহাদ ও জিহাদ সংশ্লিষ্ট আবশ্যকীয় বিষয়বলিকে অবজ্ঞা করছে, তাহলে তিনি অবশ্যই কারামতি (মুরতাদ কারামতি কর্তৃক দখলকৃত একটি দেশ) রাষ্ট্রের মতো দেশগুলোকে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর মতোই ‘দারুল হারব’ বলতেন। শুধু তাই নয়; বরং যেসব রাষ্ট্রের এ অবস্থা, সবগুলোর ব্যাপারেই তিনি এমন ফতোয়া দিতেন।’ (শারহু মুখতাসারিত তাহাবি : ৭/২১৮, প্রকাশনী : দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়া, বৈরুত)

ইমাম জাসসাস রহ.-এর এ ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অতিরিক্ত দুটি শর্তারোপ মৌলিক হিসেবে নয়; বরং তাঁর যুগের অবস্থা ও প্রেক্ষাপট দেখে বলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অবস্থার অবনতি ও মুসলমানদের গাফলতি বৃদ্ধি পাওয়ায় তার অতিরিক্ত শর্ত দুটির কার্যকারিতা আর বহাল থাকেনি। তাই সাহিবাইনের ফতোয়া অনুযায়ীই এখন আমল হবে। আর এটা শুধু সাহিবাইনেরই নয়; বরং অন্যান্য অধিকাংশ ফকিহ ও ইমামের মতও এমনই।

বাকি থেকে যায়, এ রাষ্ট্রের চারপাশে যদি কোনো দারুল হারব না থাকে কিংবা দেশের জনগণের পূর্বের নিরাপত্তাচুক্তি বাতিল না করা হয় তাহলে তো তাদের কর্তৃত্ব পূর্ণাঙ্গ ও শক্তিশালী হয় না। সুতরাং এটাকে ‘দারুল হারব’ কীভাবে বলা হবে? এর উত্তরে বলা যায় যে, যখন একটা রাষ্ট্রে কেউ ভিন্ন আইন ও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে ফেলে তখন চারপাশে যতই ‘দারুল ইসলাম’ থাকুক না কেন, বুঝাই যায় যে, তারা এদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়। যদি সক্ষমই হতো তাহলে তো এরা এ দেশ দখলই করতে পারত না, অনুরূপ এ দেশে তাদের কুফরি আইনও চালু করতে পারত না। তাই কাকিরদের দখলকৃত রাষ্ট্রের চারপাশে কেবল ‘দারুল ইসলাম’ থাকার ভিত্তিতে সে দেশকে ‘দারুল ইসলাম’ বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই। এর স্বপক্ষে আমরা কয়েকটি কারণ তুলে ধরছি :

প্রথমত, এটা খুবই স্বাভাবিক যে, কখনও আল্লাহ মুসলমানদের অন্তরে ভীতি বিস্তার করে দেন। তাদেরকে লাঞ্ছনার শাস্তি আন্বাদন করান। তখন উক্ত দখলকৃত ‘দারুল ইসলাম’-এর চারপাশেই শুধু নয়; বরং পৃথিবীর অর্ধেক জায়গাজুড়ে ‘দারুল ইসলাম’ থাকলেও দেখা যায়, সবাই মিলেও ওই মধ্যবর্তী রাষ্ট্রের

বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে না। এর বাস্তব উদাহরণ হলো বর্তমানের ইসরাইল। মুসলমানদের মূলকেন্দ্র আরব রাষ্ট্রসমূহের মাঝে অবস্থিত ছোট একটি জায়গায় তারা তাদের সব ধরনের কুফরি কর্ম ও বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদের বিরুদ্ধে কিছু করার মতো সক্ষমতা মুসলমানদের নেই। বর্তমান সময়ের এমন একজন হক্কানি আলিমকেও পাওয়া যাবে না, যে কিনা ইসরাইলকে ‘দারুল ইসলাম’ বলবে; অথচ তার চারপাশেই কিস্ত লক্ষ-কোটি মুসলমানদের বসবাস!

দ্বিতীয়ত, ‘দারুল ইসলাম’-এর দখলকৃত রাষ্ট্রটি ‘দারুল হারব’ হওয়ার জন্য ‘দারুল হারব’-এর সাথে সংযুক্ত থাকা মূলত যৌক্তিক কোনো শর্ত নয়। কেননা, পার্শ্ববর্তী ‘দারুল হারব’ রাষ্ট্রটি হয়তো এমন দুর্বল হবে, যার থাকা বা না-থাকার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। আর ইমাম আবু হানিফা রহ. তো নিঃশর্ত ‘দারুল হারব’-এর শর্তারোপ করেছেন, শক্তিশালী ‘দারুল হারব’ থাকার কথা বলেননি। অতএব, কোনো কাফিরদের দখলকৃত ‘দারুল ইসলাম’-এ কুফরি আইন-শাসন চালু হওয়া এবং খলিফার পূর্বের নিরাপত্তাচুক্তি বাতিল হওয়ার পর যদি দেখা যায়, তার পাশে সামরিকভাবে খুবই দুর্বল একটি ‘দারুল হারব’ আছে, তাহলে তাঁর শর্তানুসারে তো সেটা ‘দারুল হারব’ হয়ে যাওয়ার কথা; অথচ তাঁর এ শর্তারোপের মূলভিত্তি ছিল, পাশে ‘দারুল হারব’ থাকার কারণে এ রাষ্ট্রটির প্রভাব ও শক্তি সুদৃঢ় সাব্যস্ত করা। কিস্ত ইমাম আবু হানিফা রহ. বা তাঁর অনুসারী কোনো ফকিহ-ই দখলকৃত ‘দারুল ইসলাম’-এর পাশে এমন শক্তিশালী ‘দারুল হারব’ থাকার কথা বলেননি। তাহলে যে ভিত্তিতে এ শর্ত করা হলো, সেটাই যখন প্রযোজ্য হচ্ছে না, তাহলে এমন শর্ত করাটা অতিরিক্ত একটি বিষয় হবে, যা ‘দারুল হারব’ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না।

তৃতীয়ত, চারপাশে ‘দারুল ইসলাম’ থাকা সত্ত্বেও যখন কোনো ‘দারুল ইসলাম’-এ কাফিররা কুফরি আইন ও শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, তখন প্রতীয়মান হবে যে, চারপাশের ‘দারুল ইসলাম’-এর শাসকরা হয় গাদ্দারি করে কাফিরদের সজ্জ দিয়েছে, যদ্রফন তারাও মুরতাদ হয়ে গিয়েছে, কিংবা দুর্বলতার দরফন তারা কাফিরদের প্রতিহত করতে পারেনি। সুতরাং এই যখন অবস্থা তাহলে চারপাশে অন্য কোনো ‘দারুল হারব’ না থাকায় কী-ই আর এমন সমস্যা হবে! তারা তো নির্দিধায়ই তথায় তাদের খেয়াল-খুশি অনুসারে কুফরি আইন ও শাসন প্রতিষ্ঠা

করবে। হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে, পরবর্তী সময়ে অন্য কোনো শক্তিশালী মুসলিম সেনাপতির হাতে এ ‘দারুল হারব’-এর পতন ঘটবে। কিন্তু এর কারণে তো পূর্বের কাফির-শাসিত রাষ্ট্রকে আমরা ‘দারুল ইসলাম’ বলতে পারি না। কোনো রাষ্ট্র কুফরি শাসনব্যবস্থায় পরিচালিত হবে, আর শুধু চারপাশে দুর্বল ও নামকাওয়াস্তে ‘দারুল ইসলাম’ থাকায় সেটাকেও ‘দারুল ইসলাম’ বলতে হবে, এটা কোনো যুক্তিতেই সঠিক হতে পারে না।

চতুর্থত, দখলকৃত ‘দারুল ইসলাম’-এর কোনো সীমান্তে ‘দারুল হারব’ থাকলেও এটা খুবই সম্ভব যে, তারা হয়তো পার্থিব কোনো স্বার্থের কারণে এ দখলকারী কাফিরদের শত্রু হবে। হাদিসের ভাষ্যানুসারে যদিও কাফিরদের এক জাতি বলা হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, তাদের মধ্যে কখনও শত্রুতা সৃষ্টি হবে না কিংবা তাদের একদল অন্য দলের বিরোধিতা করার জন্য কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব করবে না। এটা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বাস্তব একটি বিষয়, যা অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। হাদিসের অর্থ হলো, কাফিরদের কাউকে আমরা আপন ভাবব না। কোনো কারণে তারা আমাদের সঙ্গ দিলেও মৌলিকভাবে তারা আমাদের শত্রু। এখানে মূলত জিনস (জাতীয়তা) বুঝানো হয়েছে, যা ব্যাপকতা বুঝালেও ইসতিগরাক (সামগ্রিকতা) বুঝায় না। তাই তো ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক সময় কোনো কাফির রাষ্ট্র অন্য একটি কাফির রাষ্ট্রের সাথে শত্রুতা থাকায় তার ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব ও চুক্তি করে। যেমনটি স্পেন বিজয়ের ইতিহাসে দেখা গিয়েছিল। অতএব, দখলকৃত ‘দারুল ইসলাম’-এর পাশে মুসলিমদের সাথে এমন মিত্রতাভাবাপন্ন কোনো ‘দারুল হারব’ থাকলে এতে দখলকারী কাফিরদের কোনোই লাভ নেই; উল্টো শত্রুতা থাকায় বরং তা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. যে ভিত্তিতে এ শর্তারোপ করেছিলেন, দেখা যাচ্ছে শর্ত পাওয়া গেলেও সে মূলভিত্তিটি পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এমন শর্ত করার দ্বারা আলাদা কোনো ফায়োদা নেই।

পঞ্চমত, আর ‘দারুল ইসলাম’ দখলে নিয়ে কাফিররা তথায় কুফরি শাসনব্যবস্থা চালু করলেও এটা হতে পারে যে, কোনো কারণবশত পূর্বের নিরাপত্তাচুক্তি তারা এখনও বহাল রেখেছে। কিন্তু এর অর্থ কখনো এ হওয়া জরুরি নয় যে, তারা ভীত হওয়ায় বা দুর্বল হওয়ায় পূর্বের নিরাপত্তাচুক্তি বাতিল করছে না। এমন হলে তো তারা এ দেশ দখলই করতে পারত না। আর নিরাপত্তাচুক্তি বাতিল করার চাইতে

তথায় কুফরি শাসনব্যবস্থা চালু করা অনেকগুণে বেশি কঠিন ও সাহসের ব্যাপার। যখন তারা সে দেশে তাদের কুফরি শাসনব্যবস্থা চালু করতে পেরেছে, তখন পূর্বের নিরাপত্তাচুক্তি বাতিল করতে আর কতক্ষণের ব্যাপার! তাই এর ভিত্তিতে এ ফলাফল বের করা ভুল হবে যে, সম্ভবত তারা প্রবল ও শক্তিশালী না হওয়ায় পূর্বের নিরাপত্তাচুক্তি বাতিল করেছে না। বরং এটার সম্ভাবনাই প্রবল যে, হয়তো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকায় এটা বাতিল করার চিন্তা পরে করবে বা এটা তাদের নীতি ও স্বার্থবিরোধী কিছু হচ্ছে না কিংবা এতে তারা অন্য কোনো কল্যাণ দেখছে; এমন বিভিন্ন কারণেই পূর্বের চুক্তি বাতিল না করার সম্ভাবনা আছে। তাই একটি সম্ভাবনাকে নিশ্চিত ধরে তার ভিত্তিতে কাফিরদের দুর্বল প্রমাণ করে সেটাকে ‘দারুল ইসলাম’ আখ্যায়িত করা দুর্বল যুক্তির কথা।

এছাড়াও আরও একাধিক কারণে প্রমাণ হয় যে, এ মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতের চাইতে তাঁর দু’ছাত্র তথা ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ., পাশাপাশি ইমাম মালিক রহ., ইমাম আহমাদ রহ.-সহ জমহুরের মত অনেক বেশি শক্তিশালী। অতএব, বর্তমানে আমরা জমহুরের মতের ভিত্তিতেই ‘দারুল হারব’ চিহ্নিত করব। শুধু দেখা হবে যে, সেখানে আল্লাহর আইনের বিপরীতে মানবরচিত আইনের শাসনব্যবস্থা চালু আছে কিনা। চালু থাকলে বুঝতে হবে সেটা ‘দারুল হারব’; যদিও তার অধিকাংশ নাগরিক মুসলিম হোক। অনুরূপ কোথাও আল্লাহর আইন ও শাসনব্যবস্থা চালু থাকলে বুঝতে হবে, সেটা ‘দারুল ইসলাম’; যদিও তার অধিকাংশ জনগণ কাফির হোক। তবে উল্লেখ্য যে, এই ইখতিলাফ শুধু ওই সকল ভূখণ্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে একবার ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে তারপর তাতে কুফর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যথায় কোনো ভূখণ্ড যদি এমন হয়, যেখানে ইসলামের আবির্ভাবের পর কখনও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত-ই হয়নি, তাহলে সেটা ‘দারুল হারব’ হওয়ার ব্যাপারে কারও কোনো মতভেদ নেই; যদিও তথায় উপরিউক্ত তিন শর্ত না পাওয়া যাক।

এ হিসেবে আমরা তাত্ত্বিকভাবে ভূখণ্ডকে চারভাগে ভাগ করতে পারি। এক. এমন ভূখণ্ড, যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কখনো কুফরি আইন বা শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দুই. এমন ভূখণ্ড, যেখানে কোনো কালেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি; বরং সর্বদাই সেখানে কুফরি আইন ও শাসনব্যবস্থা চলে আসছে। তিন. এমন ভূখণ্ড, যেখানে ইসলামের আবির্ভাবের পর প্রথমে কুফরি আইন ও শাসন

প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে তথায় ইসলামি আইন বা শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চার. এমন ভূখণ্ড, যেখানে একসময় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল, এরপর আবারও তাতে কুফরি আইন ও শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং প্রথম প্রকারটি সবার ঐকমত্যে ‘দারুল ইসলাম’। দ্বিতীয় প্রকারটি সবার ঐকমত্যে ‘দারুল হারব’। তৃতীয় প্রকারটি সবার ঐকমত্যে ‘দারুল ইসলাম’। আর চতুর্থ প্রকারটি হলো মতানৈক্যপূর্ণ। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে এতে আরও দুটি শর্ত (অর্থাৎ কোনো ‘দারুল হারব’-এর সীমান্তের সাথে মিলিত থাকা এবং পূর্বের নিরাপত্তাচুক্তি বাতিল করে দেওয়া) পাওয়া গেলে তবেই এটা ‘দারুল হারব’ হবে, অন্যথায় তা ‘দারুল ইসলাম’ বলে গণ্য হবে। আর জমহুর ফুকাহায়ে কিরামের মতে এটাও ‘দারুল হারব’। আর এটাই বিশুদ্ধ মত।

পঞ্চম অধ্যায় :

‘দারুল ইসলাম’ ও ‘দারুল হারব’-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধান

‘দারুল হারব’-এ বসবাস ও ভ্রমণ :

‘দারুল হারব’-এ যদি পরিপূর্ণভাবে ইসলামি বিধিবিধান পালনের সুযোগ না থাকে, ইসলামের সব শিআর (নিদর্শন বা প্রতীক) প্রকাশের অনুমোদন না থাকে, তাহলে স্বেচ্ছায় সে দেশে মুসলমানদের জন্য বসবাস করা হারাম। সামর্থ্য থাকার শর্তে এক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই এমন জায়গায় হিজরত করা আবশ্যিক, যেখানে ইসলামের সকল বিধান প্রকাশ্যে মেনে চলা সম্ভব। আর যদি পুরোপুরিভাবে ইসলাম পালন ও শিআর প্রকাশের সুযোগ থাকে, তাহলে দেশের কুফরি ব্যবস্থার প্রতি অন্তরে পরিপূর্ণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ রেখে বসবাস করা জায়িজ হলেও তা নিরাপদ ও উত্তম নয়। তবে শরয়ি কোনো কল্যাণের উদ্দেশ্য থাকলে এক্ষেত্রে থাকাটাই বরং উত্তম। যেমন : অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়া, দীন শিক্ষা দেওয়া, ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য প্রচেষ্টা ও তথ্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি।

আর ওই সব দেশে ভ্রমণ করার ক্ষেত্রে নীতি হলো, প্রয়োজন ছাড়া বিনোদন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে অমুসলিমদের দেশে যাওয়াও নাজায়িজ। কেননা, এতে কোনো প্রয়োজন ছাড়াই নিজের দীন ও চরিত্রকে আশঙ্কার মুখে ফেলা হয়। তবে দীনি বা পার্শ্বিক বৈধ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে যাওয়া যাবে। যেমন : চিকিৎসা, ব্যবসা, বৈধ শিক্ষা, দ্বীনের দাওয়াত ইত্যাদি। তবে এর বৈধতার জন্য তিনটি শর্ত আছে। এক. তার দ্বীনের ব্যাপারে এতটুকু জ্ঞান থাকতে হবে, যদ্বারা সে দ্বীনের ব্যাপারে সংশয়ে পড়া থেকে বাঁচতে পারে। দুই. তার এতটুকু চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকতে হবে, যার ভিত্তিতে সে সকল অশ্লীলতা ও নোংরামি থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারে। তিন. সে দেশে পূর্ণভাবে দীন পালন করার স্বাধীনতা থাকতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ

وَالنَّسَاءَ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. فَأُولَئِكَ عَسَى
اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.

‘যারা নিজেদের ওপর জুলুম করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা দুনিয়াতে অসহায় ছিলাম। তাঁরা প্রত্যুত্তরে বলেন, আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে? এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস! তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথও খুঁজে পায় না, আল্লাহ অচিরেই তাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।’ (সূরা আন-নিসা : ৯৭-৯৯)

জারির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ

‘আমি প্রত্যেক ওই মুসলিম থেকে দায়মুক্ত, যে মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে।’ (সুনানু আবি দাউদ : ৩/৪৫, হা. নং ২৬৪৫, প্রকাশনী : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত)

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا، أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى
أَعْمَالِهِمْ

‘আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতির ওপর আজাব অবতীর্ণ করেন, তখন তাদের মধ্যে যারা থাকে, সবাইকে সেই আজাব গ্রাস করে। অতঃপর তাদের (ভালোমন্দ) আমলের ভিত্তিতে তাদের পুনরুত্থান করা হবে।’ (সহিহুল বুখারি : ৯/৫৬, হা. নং ৭১০৮, প্রকাশনী : দারুল তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন :

وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا مَشْرُوعِيَّةُ الْهَرَبِ مِنَ الْكُفَّارِ وَمِنَ الظَّلَمَةِ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ
مَعَهُمْ مِنَ الْإِقَاءِ التَّفْهِيسِ إِلَى التَّهْلُكَةِ هَذَا إِذَا لَمْ يُعْنَهُمْ وَلَمْ يَرْضَ بِأَفْعَالِهِمْ
فَإِنْ أَعَانَ أَوْ رَضِيَ فَهُوَ مِنْهُمْ وَيُؤَيِّدُهُ أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِسْرَاعِ فِي
الْخُرُوجِ مِنْ دِيَارِ ثَمُودَ

‘এ হাদিস থেকে কাফির ও জালিমদের থেকে পালানোর শরয়ি অনুমোদন বুঝা যায়। কারণ, তাদের সাথে বসবাস করা নিজেকে ধ্বংসের মাঝে নিষ্ক্ষেপ করার নামান্তর। এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যখন সে তাদের সাহায্য করবে না এবং তাদের কর্মকাণ্ডে সম্মত হবে না। কিন্তু যদি সে তাদের সাহায্য করে অথবা তাদের প্রতি সম্মতি প্রকাশ করে, তবে সে তাদেরই একজন (অর্থাৎ কাফিরদের অন্তর্গত) বলে গণ্য হবে। সামুদের জনপদ থেকে রাসুলুল্লাহ সালাম্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান এ কথারই সমর্থন করে।’ (ফাতহুল বারি : ১৩/৬১, প্রকাশনী : দারুল মারিফা, বৈরুত)

ইমাম আবু মুহাম্মাদ বিন হাজার রহ. এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ مَنْ خَرَجَ عَنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فَقَدْ أَبَقَ عَنْ
اللَّهِ تَعَالَى، وَعَنْ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ وَجَمَاعَتِهِمْ، وَيُبَيِّنُ هَذَا حَدِيثُهُ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ» وَهُوَ -
عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَا يَبْرَأُ إِلَّا مِنْ كَافِرٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: ১৬] . فَصَحَّ بِهَذَا أَنَّ مَنْ لَحِقَ بِدَارِ الْكُفْرِ
وَالْحَرْبِ مُخْتَارًا مُحَارِبًا لِمَنْ يَلِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ بِهَذَا الْفِعْلِ مُرْتَدٌّ لَهُ
أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ كُلُّهَا: مِنْ وَجُوبِ الْقَتْلِ عَلَيْهِ، مَتَى قُدِرَ عَلَيْهِ، وَمِنْ إِبَاحَةِ
مَالِهِ، وَانْفِسَاحِ نِكَاحِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
- لَمْ يَبْرَأْ مِنْ مُسْلِمٍ. وَأَمَّا مَنْ قَرَّ إِلَى أَرْضِ الْحَرْبِ لِظُلْمِ خَافَهُ، وَلَمْ يُحَارِبْ

المُسْلِمِينَ، وَلَا أَعَانَهُمْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَجِدْ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ يُجِيرُهُ، فَهَذَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مُضْطَرُّ مُكْرَهٌ. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الزُّهْرِيَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شَهَابٍ: كَانَ عَازِمًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ مَاتَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ، لِأَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ يَزِيدَ كَانَ نَذَرَ دَمَهُ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَهُوَ كَانَ الْوَالِي بَعْدَ هِشَامٍ فَمَنْ كَانَ هَكَذَا فَهُوَ مَعْدُورٌ. وَكَذَلِكَ: مَنْ سَكَنَ بِأَرْضِ الْهِنْدِ، وَالسَّنْدِ، وَالصَّيْنِ، وَالتُّرْكِ، وَالسُّودَانِ وَالرُّومِ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ هُنَالِكَ لِثِقَلِ ظَهْرٍ، أَوْ لِقَلَّةِ مَالٍ، أَوْ لضعفِ جِسْمٍ، أَوْ لِمَتَنَاجِ طَرِيقٍ، فَهُوَ مَعْدُورٌ. فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مُحَارِبًا لِلْمُسْلِمِينَ مُعِينًا لِلْكَفَّارِ يَخْدُمُهُ، أَوْ كِتَابِيَّةً: فَهُوَ كَافِرٌ - وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يُقِيمُ هُنَالِكَ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، وَهُوَ كَالذَّمِّيِّ لَهُمْ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الدَّخَالِ بِجُمُوهَرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَرْضِهِمْ، فَمَا يَبْعُدُ عَنِ الْكُفْرِ، وَمَا تَرَى لَهُ عُذْرًا - وَنَسَأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ: مَنْ سَكَنَ فِي طَاعَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ مِنَ الْعَالِيَةِ؛ وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ، لِأَنَّ أَرْضَ مِصْرَ وَالْقَيْرَوَانَ، وَغَيْرَهُمَا، فَإِلَّا سَلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ، وَلَا تُهْمُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ لَا يُجَاهِرُونَ بِالْبِرَاءَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ، بَلْ إِلَى الْإِسْلَامِ يَنْتَمُونَ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَقِيقَةِ أَمْرِهِمْ كُفَّارًا. وَأَمَّا مَنْ سَكَنَ فِي أَرْضِ الْقَرَامِطَةِ مُحْتَارًا فَكَافِرٌ بِلَا شَكٍّ، لِأَنَّهُمْ مُعَلِّثُونَ بِالْكَفْرِ وَتَرْكِ الْإِسْلَامِ - وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا مَنْ سَكَنَ فِي بَلَدٍ تَظْهَرُ فِيهِ بَعْضُ الْأَهْوَاءِ الْمُخْرِجَةِ إِلَى الْكُفْرِ، فَهُوَ لَيْسَ بِكَافِرٍ، لِأَنَّ اسْمَ الْإِسْلَامِ هُوَ الظَّاهِرُ هُنَالِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، مِنَ التَّوْحِيدِ، وَالْإِقْرَارِ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْبِرَاءَةِ مِنْ كُلِّ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَسَائِرِ الشَّرَائِعِ الَّتِي هِيَ الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَقَامَ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ» يُبَيِّنُ مَا قُلْنَا، وَأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ دَارَ الْحَرْبِ، وَإِلَّا فَقَدْ اسْتَعْمَلَ -

عَلَيْهِ السَّلَامُ - عُمَاةُ عَلَى خَيْرٍ، وَهُمْ كُلُّهُمْ يَهُودُ. وَإِذَا كَانَ أَهْلُ الدِّمَةِ فِي مَدَائِنِهِمْ لَا يُمَارِجُهُمْ غَيْرُهُمْ فَلَا يُسَمَّى السَّاكِنُ فِيهِمْ - لِإِمَارَةِ عَلَيْهِمْ، أَوْ لِتِجَارَةٍ - بَيْنَهُمْ: كَافِرًا، وَلَا مُسِيئًا، بَلْ هُوَ مُسْلِمٌ حَسَنٌ، وَدَارُهُمْ دَارُ إِسْلَامٍ، لَا دَارَ شِرْكَ، لِأَنَّ الدَّارَ إِنَّمَا تُنْسَبُ لِلْغَالِبِ عَلَيْهَا، وَالْحَاسِمُ فِيهَا، وَالْمَالِكُ لَهَا. وَلَوْ أَنَّ كَافِرًا مُجَاهِدًا غَلَبَ عَلَى دَارٍ مِنْ دُورِ الْإِسْلَامِ، وَأَقَرَّ الْمُسْلِمِينَ بِهَا عَلَى حَالِهِمْ، إِلَّا أَنَّهُ هُوَ الْمَالِكُ لَهَا، الْمُنْفَرِدُ بِنَفْسِهِ فِي ضَبْطِهَا، وَهُوَ مُعَلِّنٌ بِيَدَيْنِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ لَكُفْرٍ بِالْبَقَاءِ مَعَهُ كُلِّ مَنْ عَاوَنَهُ، وَأَقَامَ مَعَهُ - وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ مُسْلِمٌ - لِمَا ذَكَرْنَا.

‘আর আমরা জেনেছি যে, যে ব্যক্তি “দারুল ইসলাম” থেকে বের হয়ে “দারুল কুফর”-এ চলে যাবে, সে আল্লাহ থেকে, খলিফা থেকে ও মুসলমানদের দল থেকে পলায়ন করল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ হাদিস থেকে পলায়ন করল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ হাদিস “তিনি মুশরিকদের মাঝে বসবাসরত মুসলিমের ব্যাপারে দায়মুক্ত।” বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দেয়। আর তিনি কেবল কান্নার থেকেই দায়মুক্ত ও সম্পর্কহীন হতে পারেন (কোনো মুসলমান থেকে নয়)। আল্লাহ তাআলা বলেন, “ইমানদার পুরুষরা ও ইমানদার নারীরা একে অপরের সুহদা।” [সূরা আত-তাওবা : ৭১] সুতরাং এ থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণ হয় যে, যে ব্যক্তি নিকটবর্তী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে স্বেচ্ছায় “দারুল কুফর”-এ যোদ্ধা হিসেবে চলে যায়, সে তার এই অপরাধের কারণে মুরতাদ হয়ে যায়। তার ওপর মুরতাদের সব হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেমন : প্রেফতার করতে সক্ষম হলে তাকে হত্যা করা, তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, বিয়ে ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো মুসলমান থেকে দায়িত্বমুক্তির ঘোষণা করেননি। (অথচ পূর্বের হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকদের মাঝে বসবাসকারী ব্যক্তি থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দায়মুক্ত ও সম্পর্কহীন। অতএব, প্রমাণ হলো যে, “দারুল হারব”-এ চলে যাওয়া ব্যক্তি পূর্বে মুসলিম থাকলেও ওখানে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সম্পর্কহীন হওয়ায় মুরতাদ হয়ে গিয়েছে।) আর যে ব্যক্তি নিজের ওপর জুলুমের আশঙ্কায় কোনো “দারুল হারব”-এ পলায়ন করে, আর সে মুসলমানদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধও করে না, তাদের বিপরীতে কাফিরদের সাহায্যও করে না এবং মুসলমানদের মধ্যে এমন কাউকে পায় না, যে তাকে আশ্রয় দেবে, তাহলে এতে তার কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, সে অপারগ ও বাধ্য। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইমাম জুহরি রহ. এ সংকল্প করেছিলেন যে, খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক মারা গেলে তিনি রোমে চলে যাবেন। কেননা, অলিদ বিন ইয়াজিদ ক্ষমতা পেলে তাঁকে হত্যা করার মান্নত করেছিল। আর হিশামের পর সেই ছিল (নির্ধারিত) খলিফা। অতএব যার অবস্থা এমন হবে, তাকে মাজুর ও ক্ষমাযোগ্য ধরা হবে। তেননাই যেসব মুসলমান ভারত, শ্রীলঙ্কা, চীন, তুরস্ক, সুদান, ইতালি ইত্যাদি রাষ্ট্রে বসবাস করে, সে যদি বার্কাক্য, দারিদ্র্য, অসুস্থতা বা দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদির কারণে চলে আসতে সক্ষম না হয়, তাকে মাজুর হিসাবে গণ্য করা হবে। সে যদি সেখানে কাফিরদের খিদমত, লেখালেখি ইত্যাদির মাধ্যমে মদদ দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে সেও কাফির বলে গণ্য হবে। আর যদি সে “দারুল হারব”-এ দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে আসে এবং তাদের কাছে জিম্মির মতো হয়ে থাকে; অথচ সে মুসলিম সমাজ বা দেশে চলে আসতে সক্ষম, তাহলে সে কুফর থেকে দূরে নয় এবং আমরা তার কোনো ওজর আছে বলে মনে করি না। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করছি। তবে কুফরকারী শাসক তথা সীমালঙ্ঘনকারী ও এ জাতীয় শাসকদের আনুগত্যে যারা বসবাস করবে, তারা তাদের (কাফিরদের কুফরি রাষ্ট্রে বসবাসকারীদের) মতো নয়। কেননা, মিশর, কাইরাওয়ান প্রমুখ অঞ্চলে ইসলামই বিজয়ী এবং সবকিছুর পরও এসব দেশের শাসকরা প্রকাশ্যে ইসলাম থেকে বারাতের (দায়মুক্তির) ঘোষণা দেয়নি; বরং ইসলামের সাথেই সম্পৃক্ত হওয়ার দাবি করে; যদিও তাদের কর্মের বাস্তবতায় তারা কাফির। তবে যারা স্বেচ্ছায় কারামতিদের (শিয়াদের মধ্যে অত্যন্ত উগ্র ও নিকৃষ্ট একটি দলের নাম কারামতি। এদের নেতা আবু তাহির কারামতি সে-ই নরাদম, যে ৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় আক্রমণ করে এবং অসংখ্য হাজিদের হত্যা করে হাজরে আসওয়াদ পাথর চুরি করে নিয়ে যায়। প্রায় বাইশ বছর পর তা পুনরায় যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়।) দেশে বসবাস করবে, তারা নিঃসন্দেহে কাফির। কেননা, তারা প্রকাশ্যে কুফর ও ইসলাম পরিত্যাগের ঘোষণা দিয়েছে। আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আর যে ব্যক্তি এমন দেশে বসবাস করবে, যেখানে কুফরি পর্যায়ে কিছু প্রবৃত্তিপূজা প্রকাশ পায়, তাহলে সে (বসবাসকারী) কাফির হবে না। কেননা, সর্বাবস্থায় সেখানে তাওহিদের

অস্তিত্ব, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রিসালাতের স্বীকৃতি, ইসলাম ভিন্ন অন্য সব ধর্ম থেকে মুক্ত ঘোষণা, সালাত প্রতিষ্ঠা, রমজানের সিয়াম পালন এবং ইসলাম ও শরিয়তের সকল বিষয় থাকার ভিত্তিতে ইসলামই বিজয়ী। আর সকল প্রশংসা সারা জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী “আমি প্রত্যেক ওই মুসলিম থেকে দায়মুক্ত, যে মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে” আমাদের কথাকে স্পষ্ট করে দেয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদ্বারা এখানে “দারুল হারব” উদ্দেশ্য নিয়েছেন। নইলে তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারে তাঁর দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছেন; অথচ ওখানকার সব অধিবাসীই ইহুদি ছিল। যখন জিম্মিগণ তাদের শহরে থাকবে এবং তাদের সাথে অন্যরা মেলামেশা করবে না, তাহলে মুসলমানদের কর্তৃত্ব ও পারস্পরিক ব্যবসায়িক লেনদেনের কারণে তথায় বসবাসকারী (মুসলিম) ব্যক্তিকে কাফিরও বলা যাবে না, গুনাহগারও বলা যাবে না; বরং সে একজন উত্তম মুসলমান। তাদের বসবাসের স্থানকে “দারুল ইসলাম” বলা হবে, “দারুল শিরক” নয়। কেননা, কোনো দেশের বিজয়ী, শাসক ও মালিকের ভিত্তিতেই (“দারুল ইসলাম” বা “দারুল হারব” বলে) দেশের নাম নির্ধারিত হয়। কোনো প্রকাশ্য কাফির যদি “দারুল ইসলাম”-এর কোনো এলাকা দখল করে নেয় এবং মুসলমানদেরকে তাদের আপন অবস্থায় বহাল রাখে, সে উক্ত এলাকার একচ্ছত্র অধিপতি বনে বসে এবং নিজেকে অমুসলিম হিসেবে ঘোষণা করে, তাহলে তাতে অবস্থানকারী যে-ই তাকে সাহায্য করবে এবং তার সাথে থাকবে, সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে; যদিও সে (অবস্থানকারী নাগরিক) নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করুক।’ (আল-মুহাল্লা, ইবনু হাজাম : ১২/১২৫-১২৬, প্রকাশনী : দারুল ফিকর, বৈরুত)

জিম্মি, মুআহিদ ও মুসতামিন গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পরিভাষা

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে আমাদের তিনটি শব্দের অর্থ বুঝে রাখা উচিত। এক : জিম্মি। জিম্মি বলা হয় এমন কাফিরকে, যে ‘দারুল ইসলাম’-এ জিজিয়া দিয়ে মুসলমানদের মতোই নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বসবাস করে। দুই : মুআহিদ বা চুক্তিবদ্ধ। চুক্তিবদ্ধ বলা হয় এমন কাফিরকে, যে তার নিজ দেশ

‘দারুল হারব’-এ বসবাস করে, কিন্তু তার দেশের সাথে খলিফার চুক্তি হয়েছে যে, তারাও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, আর মুসলিমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। তিন : মুসতা’মিন বা নিরাপত্তাপ্রার্থী। মুসতা’মিন বলা হয় এমন কাফিরকে, যার দেশের সাথে মুসলমানদের কোনো চুক্তি নেই। কিন্তু সে খলিফা বা তার কোনো প্রতিনিধির কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিরাপত্তা নিয়ে ‘দারুল ইসলাম’-এ প্রবেশ করেছে; ব্যবসা করা কিংবা দীন শেখা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে।

মাওসুআতুল ফিকহিয়া-তে বলা হয়েছে :

أَهْلُ الذَّمِّ هُمُ الْكُفَّارُ الَّذِينَ أَقْرُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ عَلَى كُفْرِهِمْ بِالْإِزْمِ الْجَزِيَّةِ وَتُفَوِّذَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ فِيهِمْ... أَهْلُ الْعَهْدِ: هُمُ الَّذِينَ صَلَّحَهُمْ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى إِنْهَاءِ الْحَرْبِ مُدَّةً مَعْلُومَةً لِمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا، وَالْمُعَاهِدُ: مِنَ الْعَهْدِ: وَهُوَ الصُّلْحُ الْمُوقَّتُ، وَيُسَمَّى الْهُدْنَةُ وَالْمُعَاهَدَةُ وَالْمُسَالَمَةُ وَالْمُؤَادَعَةُ... الْمُسْتَأْمَنُ فِي الْأَصْلِ: الطَّالِبُ لِلْأَمَانِ، وَهُوَ الْكَافِرُ يَدْخُلُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ، أَوْ الْمُسْلِمُ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْكُفَّارِ بِأَمَانٍ.

‘জিম্মি বলা হয় ওই সব কাফিরকে, যাদেরকে জিজিয়া দেওয়া ও তাদের মাঝে ইসলামি বিধিবিধান প্রয়োগ করার শর্তে কাফির অবস্থায় “দারুল ইসলাম”-এ বসবাস করতে দেওয়া হয়। ...মুআহিদ বা চুক্তিবদ্ধ বলা হয় ওই সব কাফিরকে, যাদের সাথে মুসলমানদের খলিফা কোনো কল্যাণকে সামনে রেখে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির চুক্তি করেছে। “মুআহিদ” শব্দটি “আহদ” শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ সাময়িক চুক্তি। এটাকে হুদনা, মুহাদানা, মুআহাদা, মুসালামা ও মুওয়াদাআও বলা হয়। ...মুসতা’মিন প্রকৃত অর্থে নিরাপত্তাপ্রার্থী। এটা হলো ওই কাফির, যে নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করেছে কিংবা মুসলিম যখন নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করবে।’ (আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া : ৭/১০৪-১০৫, প্রকাশনী : অজারাতুল আওকাফ, কুয়েত)

এ তিন ধরনের কাফিরই মুসলিমদের হাতে নিরাপদ। চুক্তি ও সবকিছু ঠিক থাকা পর্যন্ত তাদেরকে হত্যা করা যাবে না, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করা যাবে না এবং

তাদের ইজ্জতের ওপর কোনোরূপ আঘাত হানা যাবে না। এ তিন প্রকারের বাইরে যত কাফির আছে, সব অনিরাপদ। তাদের দুনিয়াতেও কোনো নিরাপত্তা নেই, আর আখিরাতে তো নেই-ই। দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জগতে তারা লাঞ্ছিত।

বুঝা গেল, পুরো পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কেবল তিন শ্রেণির লোকই মুসলমানদের হাতে নিরাপদ। এক : জিম্মি। দুই : সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ। তিন : নিরাপত্তাপ্রার্থী। পৃথিবীতে এ তিনটি শ্রেণি ছাড়া আর কোনো কাফিরই মুসলমানদের হাতে নিরাপদ নয়। তবে এ মাসআলার ভিত্তিতে যেখানে-সেখানে মারামারি বা যুদ্ধ শুরু করে দেওয়াও কিস্ত জায়িজ হবে না; যেমনটি অনেক বোকা লোক ভেবে থাকে। বরং তাদের সাথে যুদ্ধ করা, বন্দী করা ও সম্পদ লুণ্ঠন করা এগুলো আলাদা মাসআলা, যার জন্য বিস্তারিত বিধান ও নীতিমালা রয়েছে। দুটোকে এক মনে করে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। আমাদের আলোচনা কেবল পৃথিবীতে কোন কোন কাফির নিরাপদ, তাদের লিস্ট দেওয়া। এর বাইরে যারা অনিরাপদ কাফির, তাদের জন্য ভিন্নভাবে বিধান জেনে সে অনুযায়ী আচরণ করতে হবে। মনে চাইলেই যেখানে-সেখানে ইচ্ছেমতো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না।

বর্তমান বিশ্বে হারবি ও অ-হারবি কাফিরদের অস্তিত্ব

কোনো সন্দেহ নেই যে, কাফিরদের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে ছাড় ও শিথিলতা রয়েছে, তবে তা সব কাফিরের জন্য প্রযোজ্য নয়। কুরআন-হাদিসে কাফিরদের সাথে যত নম্রতার কথা পাওয়া যায় কিংবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিদের জীবনীতে যে উদারতা, নমনীয়তা ও আদর্শের দেখা মেলে, তার প্রায় সবই অ-হারবি তথা জিম্মি বা চুক্তিবদ্ধ বা নিরাপত্তাপ্রার্থী কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। আর বলার অবকাশ রাখে না যে, হারবি ও অ-হারবি উভয় শ্রেণির কাফিরদের বিধান এক নয়। পার্থক্য বিষয়াদিতে উভয়ের বিধানের ক্ষেত্রে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, বর্তমান সময়ের কাফিররা হারবি নাকি অ-হারবি? বর্তমান সময়ে জাতিসংঘ বা অন্যান্য কুফফার গোষ্ঠীর সাথে কৃত চুক্তি কি শরয়ি চুক্তি বলে বিবেচিত হবে?

প্রথমত, আমাদের জানা থাকা দরকার যে, হারবি কাদেরকে বলা হয়। অনেকের ধারণা, হারবি তাকেই বলে, যে মুসলমানদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত। ‘হারব’

শব্দের একটি অর্থ হলো যুদ্ধ। এ থেকেই মূলত অনেকের এ সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এর যে আরও অর্থ আছে এবং সে অর্থ অনুসারেই হারবিকে হারবি বলা হয়, তা অনেকেরই জানা নেই। ‘হারব’ শব্দের অর্থ যেমন ‘যুদ্ধ’, তেমনই এর আরেকটি অর্থ হলো, ‘দূরত্ব ও বিদ্বেষ’। এজন্য ফুকাহায়ে কিরাম কেবল যুদ্ধরত কাফিরকেই হারবি বলেন না; বরং আরও ব্যাপক অর্থে তাঁরা ‘হারবি’ শব্দটাকে ব্যবহার করে থাকেন।

ইমাম আবুল ফজল বা’লি রহ. বলেন :

الْحَرْبِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَرْبِ، وَهُوَ الْقِتَالُ، وَدَارُ الْحَرْبِ، أَيُّ: دَارُ التَّبَاعُدِ وَالْبُغْضَاءِ، فَالْحَرْبِيُّ بِالْإِعْتِبَارِ الثَّانِي.

“হারবি” শব্দটা “হারব”-এর দিকে সম্বন্ধীয়। “হারব” অর্থ যুদ্ধ। আর “দারুল হারব” অর্থ পারস্পরিক দূরত্ব ও বিদ্বেষের রাষ্ট্র। “হারবি”-কে এই দ্বিতীয় অর্থ তথা দূরত্ব ও বিদ্বেষের বিচারেই “হারবি” বলা হয়। (আল-মুতলি’ আলা আলফাজিল মুকনি : পৃ. নং ২৬৯, প্রকাশনী : মাকতাবাতুস সাওয়াদি)

আর শরয়ি পরিভাষায় যে সকল কাফির-মুশরিক মুসলমানদের খলিফার সাথে জিম্মাচুক্তি, সন্ধিচুক্তি বা নিরাপত্তাচুক্তিতে আবদ্ধ নয়, তাদেরকে হারবি বলা হয়। যেমন ‘আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া’-তে এদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

أَهْلُ الْحَرْبِ أَوْ الْحَرْبِيُّونَ: هُمْ غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي عَقْدِ الدِّمَةِ، وَلَا يَتَمَتَّعُونَ بِأَمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا عَهْدِهِمْ

‘হারবিগণ হলো ওই সব অমুসলিম, যারা কোনো জিম্মাচুক্তিতে প্রবেশ করেনি আর না মুসলমানদের কোনো সন্ধি বা নিরাপত্তাচুক্তির মাধ্যমে সুযোগ লাভ করেছে।’ (আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া : ৭/১০৪, প্রকাশনী : অজারাতুল আওকাফ, কুয়েত)

বর্তমান বিশ্বে যেহেতু মুসলিমদের না আছে কোনো খিলাফাব্যবস্থা আর না আছে খলিফা, তাই মুসলমানদের খলিফার সাথে কোনো রাষ্ট্রের জিম্মাচুক্তি, সন্ধিচুক্তি বা নিরাপত্তাচুক্তিও পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গত কারণেই বর্তমান বিশ্বের কাফিররা সবাই হারবি। শরয়ি দৃষ্টিতে এরা সবাই হারবি কাফির বলেই বিবেচিত হবে এবং হারবি

কাফিরদের জন্য যে বিধিবিধান আছে, তা তাদের ওপর প্রযোজ্য হবে। মুসলিম বিশ্বে খিলাফাহব্যবস্থা না থাকা ও তা পুনরুদ্ধার করতে না পারাটা যদিও বর্তমান মুসলমানদের একটি ব্যর্থতা, কিন্তু এর কারণে কাফিরদেরকে আমরা অ-হারবিও ঘোষণা করতে পারি না। তাছাড়াও মুসলমানদের খিলাফাহব্যবস্থা ধ্বংস ও তা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে না দেওয়ার পেছনে বর্তমান বিশ্বের তাগুতগোষ্ঠীর সরাসরি হাত রয়েছে, যা সঠিক ইতিহাস পড়ুয়া কারও অজানা নয়। মোটকথা যাই হোক, বর্তমান বিশ্বের কাফিররা যে শরয়ি দৃষ্টিতে হারবি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এসব কাফিরকে অ-হারবি ঘোষণা দিয়ে তাদের জন্য অ-হারবি কাফিরদের বিধান প্রযোজ্য করাটা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি বা চরম অজ্ঞতা।

বাকি থেকে যায়, জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক চুক্তির কী বিধান? তো এক্ষেত্রে প্রথম কথা হলো, এসব চুক্তির নিয়ামবলি ও শর্তসমূহের মূল উদ্ভাবক কুফরার গোষ্ঠি। তাদের সুবিধা ও স্বার্থের অনুকূলেই সব তৈরি করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো, যথা আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স সবগুলো হলো বিশ্বতাগুতের মূল। প্রকৃত অর্থে এরা যা চায়, সেটাই জাতিসংঘের নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়। সচেতনদের অজানা নয় যে, বিশ্বে কাফিরদের একাধিক ব্লক থাকলেও ইসলাম বিরোধিতায় তারা এক মেরুতে চলে আসে। তাই তাদের এসব চুক্তি ও নীতিমালার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। তৃতীয়ত, এসব চুক্তির সাথে মুসলিমদের কোনো সম্পর্ক নেই। এটাকে যদি শরয়ি অর্থে চুক্তিও বলা হয়, তাহলে বস্তুত এসব চুক্তি কাফির ও মুরতাদদের মধ্যে হয়েছে, মুসলিম আমিরের সাথে নয়। স্মর্তব্য যে, কোনো দেশের অধিকাংশ নাগরিক মুসলিম হওয়ার সত্ত্বেও সে দেশে কুফরি সংবিধান চালু থাকলে এবং সরকার সেটাকে উৎখাত না করে যথারীতি বহাল ও শক্তিশালী করলে সে সরকার মুরতাদ হিসেবে বিবেচিত হবে। এটাই ইসলামের শাস্ত্র বিধান; কেউ মানুক চাই না মানুক। মুসলিম দেশ আর ইসলামি দেশ এক জিনিস নয়। অধিকাংশ মুসলিম নাগরিকের ভিত্তিতে কোনো দেশকে মুসলিম দেশ বলা গেলেও যতক্ষণ না সে দেশের সংবিধান ও আইন-কানুন ইসলামি হবে ততক্ষণ সে দেশকে ইসলামি দেশ বলা যাবে না। অনেকে এ পার্থক্য করতে না পেরে দুটিকে একসাথে গুলিয়ে ফেলে। চতুর্থত, যদি তারা ইসলামি নীতিমালার আলোকেও চুক্তি ও শর্তাবলি আরোপ করত এবং সবাই সে চুক্তিতে একমত হতো, তবুও বর্তমানে সে চুক্তি

বহাল থাকত না। কেননা, অসংখ্যবার তারা নিজেরাই নিজেদের বানানো সেসব চুক্তি ও নিয়ম ভঙ্গ করেছে, যা আজ পুরো বিশ্ববাসীর সামনে সূর্যের আলোর ন্যায় সুস্পষ্ট। দেখুন, হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি কাফিররা একবার ভঙ্গ করা মাত্রই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা আক্রমণ করতে কিন্তু আর কোনো কিছুর অপেক্ষা করেননি। বস্তুত শক্তিই আজ সবকিছুর মূখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শক্তিই আজ সকল নীতির মূল হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই জুলুম ও শক্তির দাপটে এসব নীতিমালা ও চুক্তির কথা সবই গৌণ।

মোটকথা, জাতিসংঘের এসব ঠুনকো নীতি ও ইসলাম-বিদ্বেষী শর্তাবলী যে ইসলামের দৃষ্টিতে একেবারেই মূল্যহীন, তা বুঝতে বড় ফকিহ বা মুজতাহিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই বর্তমানের যেসব অসচেতন আলিম কিংবা মডারেট মুসলিম জাতিসংঘের নাম দিয়ে আমাদেরকে চুক্তি, নিরাপত্তা ও শান্তির বাণী শোনায়, তাদের অনুরোধ করব, ভালো করে আগে জাতিসংঘকে জানুন, এর প্রেক্ষাপট ও সঠিক ইতিহাস পড়ুন, ইসলামের ক্ষতিসাধন ও মুসলিমদের খিলাফাব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় তার জঘন্য সব পদক্ষেপ ও কুকীর্তি দেখুন, তারপর এ ব্যাপারে ফয়সালা করুন। জাতিসংঘের ভয়ংকর নীতিমালা ও গোপন উদ্দেশ্য জানলে চুক্তির নাম নেওয়া তো দূরে থাক, এর নাম নিতেও কলিজা কেঁপে উঠত এবং অন্তরে সৃষ্টি হতো প্রচণ্ড ঘৃণা। তাই বলি কি, জাতিসংঘের নামে চুক্তির অজুহাত তুলে মায়ের কাছে মামাবাড়ির গল্প শোনানোর কোনোই প্রয়োজন নেই। তার চাইতে সে সময়টুকু বিশ্বরাজনীতি, তাদের মোড়লগীরি ও ইসলামের বিরুদ্ধে তাগুতদের বৈশ্বিক ষড়যন্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করুন। আশা করি, বিষয়টি নিজেই বুঝতে পারবেন।

গণতান্ত্রিক দেশগুলোর বিধান

বর্তমান মুসলমানদের সবচেয়ে বড় একটি সমস্যা হলো, কোনো বিষয়ে ভালো ধারণা না রাখা সত্ত্বেও অনেকে চূড়ান্ত মত বা সিদ্ধান্ত বলে দেয়। দুয়েকটি হাদিস বা লোকমুখে শোনা ইসলামের ব্যাপক কোনো মূলনীতিকো সামনে রেখেই স্পর্শকাতর বিষয়েও হুঁটহাট মন্তব্য করে বসে! শুধু তাই-ই নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইসলামের ব্যাপারে সামান্য নলেজের ওপর ভিত্তি করে জেনারেল লেভেলের একজন লোক প্রাজ্ঞ ও ভালো আলিমের সাথে তর্কে করছে! অথচ তার না জানা

আছে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান, আর না সে বুঝতে পারবে শরিয়তের মূলনীতি ও স্পর্শকাতর মাসআলাগুলোর সূক্ষ্মতা। তবুও সে নিজের অপূর্ণ ধারণার ওপর ভিত্তি করেই ঝগড়া করে যায়। যেমন, ইসলামের উদারতা নিয়ে একদল উদারমনা লোকের সে কী মানবতার বহিঃপ্রকাশ! দেখে মনে হয়, দরদে সে ফেটে পড়ছে! বিশেষত আমাদের মূর্খ সমাজে কাফিরদের ক্ষেত্রে এসব উদারমানাদের বেশ কদর রয়েছে! কথা ও ভাবে প্রকাশ করে যে, এরাই সত্যিকার ইসলাম বহন করছে, আর এর বিপরীতে যারা স্পষ্ট দলিলের আলোকে কোথাও কঠোর এবং কোথাও নরম হওয়ার কথা বলে, তারা হয়ে যায় উগ্র ও ইসলামের বদনামকারী।

এমনই আরেকটি স্পর্শকাতর মাসআলা হলো গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক দেশগুলোর বিধান। আফসোস যে, এ মাসআলায় শুধু সাধারণ লোকদেরই নয়, অনেক আলিমেরও প্রাথমিক ধারণাটুকু নেই। বেশিরভাগ মানুষের ধারণা, গণতন্ত্র ইসলাম-অনুমোদিত একটি পদ্ধতি। আর এজন্যই অধুনা কালে বিভিন্ন দেশে ‘ইসলামি গণতন্ত্র’ নামে নিকৃষ্ট একটি পরিভাষার কথা শোনা যায়। অনেক আলিমকেও অজ্ঞাতসারে এ পরিভাষা ব্যবহার করতে দেখা যায়। অথচ এটা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত, বাজে ও পরিত্যক্ত একটি পরিভাষা, যার সাথে ইসলামের ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নেই। বুঝবানদের কেউ কেউ অবশ্য এটাকে হারাম বলতে চান। যার অর্থ দাঁড়ায়, এটা গুনাহের কাজ হলেও এতে ইমান নষ্ট হওয়ার মতো কোনো কারণ নেই। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এটা হালাল বা বৈধ তো দূরে থাক, হারামের স্তরেরও নয়। বরং এটা হলো স্পষ্ট কুফরি ও শিরকি একটি মতবাদ, যার রচয়িতা, সংস্কারক ও ব্যবহারকারী সামগ্রিকভাবে সবাই কাফির। অবশ্য মুসলিম দাবিদারদের মধ্য হতে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে কাফির বলতে হলে দেখতে হবে যে, তার মধ্যে ‘মাওয়ানিউত তাকফির’ (কাফির বলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক কারণসমূহ) হতে কোনোটি পাওয়া যায় কিনা। যদি পাওয়া যায় তাহলে তো তাকে মাজুর ধরা হবে এবং কুফরি থাকা সত্ত্বেও তাকে কাফির বলা থেকে বিরত থাকতে হবে, অন্যথায় সে মুরতাদ বা ইসলামত্যাগী বলে বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে আমরা এখানে সামান্য আলোকপাত করছি, যাতে সবার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, গণতন্ত্র একটি কুফরি মতবাদ।

গণতন্ত্র সম্পর্কে শরয়ি হুকুম জানার পূর্বে প্রথমে এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় জানা জরুরি। গণতন্ত্রের ইংরেজি হলো, Democracy। শব্দটি মূলত

গ্রীকভাষায় Demos এবং kratía শব্দ দু'টির সমন্বয়ে গঠিত। Demos অর্থ জনগণ আর kratía অর্থ শাসন। তাহলে Democracy এর আভিধানিক অর্থ দাঁড়াচ্ছে, জনগণের শাসন।

পারিভাষিক অর্থ :

ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকায় গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে :

Democratic System of Government : A system of government based on the principle of majority decision-making. 'সরকারের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি : সংখ্যাগরিষ্ঠ মত গ্রহণের নীতির উপর ভিত্তি করে সরকার ব্যবস্থা।' (এনকার্টা, ২০০৯, ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ২০১২)

আধুনিক গণতন্ত্রের রূপদাতা আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন গণতান্ত্রিক সরকারকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন :

Government of the people, by the people, for the people. 'জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের সরকার।' (প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন, দ্যা গোটিসবার্গ অ্যাড্রেস, নভেম্বর, ১৯, ১৮৬৩)

উইকিপিডিয়ায় গণতন্ত্রের বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে :

‘গণতন্ত্র বলতে কোনো জাতিরাষ্ট্রের (অথবা কোনো সংগঠনের) এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে নীতিনির্ধারণ বা সরকারি প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিক বা সদস্যের সমান ভোটাধিকার থাকে। গণতন্ত্রে আইন প্রস্তাবনা, প্রণয়ণ ও তৈরির ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ রয়েছে, যা সরাসরি বা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হয়ে থাকে।’ (<https://bn.wikipedia.org/wiki/গণতন্ত্র>)

সুতরাং গণতন্ত্র বলতে জনগণের স্বার্থে জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে বুঝানো হয়। তারা নিজেরাই নিজেদের জীবনব্যবস্থা তৈরি করে এবং তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজেদের সার্বভৌমিক ক্ষমতার বলে আইন রচনা করে।

এভাবে জনগণ নিজেদের ক্ষমতার অনুশীলন করে এবং নিজেরাই নিজেদের পরিচালনা করে। গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে আইন প্রণয়ণ এবং শাসক নির্বাচন করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার রয়েছে।

জনগণই এ ব্যবস্থায় বিধান প্রণয়ন করে এবং তারা নিজেদের তৈরি কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কারও কাছে জবাবদিহি করে না। জনগণই সার্বভৌমত্ব ও সকল ক্ষমতা ধারণ করে এবং জনগণই তাদের সার্বভৌমত্ব চর্চা করতে পারে। তাই বলা যায়, জনগণই এ ব্যবস্থার প্রভু। আর জীবন থেকে ধর্মকে আলাদা করাই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল বিশ্বাস এবং এ বিশ্বাসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি। এ বিশ্বাস থেকেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। ইসলাম এ বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামি আকিদার ভিত্তি হচ্ছে, জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল বিষয় আল্লাহ তাআলার আদেশ ও নিষেধই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং আল্লাহ তাআলা যে ব্যবস্থা দিয়েছেন সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে হবে। পক্ষান্তরে গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত একটি ব্যবস্থা, যার সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কোনো সম্পর্ক নেই। নিজেদের প্রবৃত্তি ও খায়েশ পূরণই এ তন্ত্রের মূলভিত্তি।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হতে বাধ্য। আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিধি-বিধান নাজিল করেছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে আল্লাহর বিধি-বিধানকে অস্বীকার করা হয়। তাই এটি মূলত আল্লাহর বিধানকে অস্বীকারকারীদের ব্যবস্থা বা এককথায় কুফরি ব্যবস্থা। সুতরাং শরিয়ার বিপরীতে তাদের রচিত ও আবিষ্কৃত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না; বরং সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা এ সকল কিছুকে বর্জন করার কঠোর নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন :

يُرِيدُونَ أَن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ

‘তারা বিচার-ফয়সালার জন্য তাগুতের কাছে যেতে চায়; অথচ তাগুতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে।’ (সূরা আন-নিসা : ৬০)

যে আকিদা থেকে এ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, যে ভিত্তির উপর এটি প্রতিষ্ঠিত এবং যে চিন্তা-ধারণার সে জন্ম দেয় তা সম্পূর্ণরূপে মুসলিমদের আকিদা বা বিশ্বাসের বিপরীত। গনতন্ত্রের আকিদা থেকে নিম্নোক্ত দু'টি ধারণার উদ্ভব হয়। এক. সার্বভৌমত্ব জনগণের জন্য। দুই. জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।

উপরিউক্ত দু'টি ধারণার ওপর ভিত্তি করেই ইউরোপের দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ তাদের ব্যবস্থা প্রণয়ন করে থাকে। এর দ্বারা পাদরিদের কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে জনগণের হাতে তা সমর্পণ করা হয়। পাদরি ও পোপদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফসল হিসেবে ধর্মীয় আইন-কানূনের অবসান করা হয়। ফলে সার্বভৌমত্ব হলো জনগণের জন্য এবং জনগণই হলো সকল ক্ষমতার উৎস। রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ দু'টি ধারণাই বাস্তবায়ন করা হলো। ফলে জনগণই হয়ে গেল সার্বভৌমত্বের প্রতীক ও সকল ক্ষমতার উৎস।

পক্ষান্তরে ইসলামে সার্বভৌমিক ক্ষমতা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। গনতন্ত্রের সাথে ইসলামের কিছু শাখাগত বিষয় বাহ্যিকভাবে এক মনে হলেও বাস্তবে এই দু'টি দ্বীন বা জীবনব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। একটি মেনে নিলে অপরটি আপনাপনিই বাতিল হয়ে যেতে বাধ্য। কোনো অবস্থাতেই উভয়টির সংমিশ্রণ হতে পারে না। হয় ইসলাম থাকবে, নচেৎ গণতন্ত্র।

আল্লাহ তাআলা সকল মাখলুকের স্রষ্টা। তাই তাদের জন্য কল্যাণ ও উপযোগী বিধিবিধান তিনিই ভালো জানেন। মানবসত্তা সাধারণত জ্ঞানগরিমা, স্বভাব-চরিত্র ও অভ্যাসের দিক দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণির হয়ে থাকে। তারা অন্যদের কল্যাণকর বিষয়াদি সম্পর্কে জানা তো দূরে থাক; স্বয়ং নিজেদের কল্যাণকর বিষয় সম্বন্ধেই অজ্ঞ। এজন্য যে সমাজ ও দেশে জনগণই সংবিধান ও আইন-কানুন প্রণয়ন করে সে দেশে দুর্নীতি, চারিত্রিক অবক্ষয় ও সামাজিক বিপর্যয় একের পর এক পরিদৃষ্ট হতেই থাকে।

সাথে এটাও লক্ষণীয় যে, অনেক দেশে এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাস্তবতাহীন এক বাহ্যিক অবয়ব ও শুধুই শ্লোগানে পরিণত হয়েছে, যার দ্বারা মানুষকে ধোঁকা দেওয়া হয়। বাস্তবিক অর্থে রাষ্ট্র পরিচালনা করে কেবল ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদের সাংসদরা। জনগণ এদের আদেশের সামনে নত ও পরাজিত থাকে। এ ব্যাপারে এর চেয়ে বড় দলিল আর কী হতে পারে যে, গণতন্ত্রের কোনো আইন

যখন রাষ্ট্রের কর্ণধারদের অভিলাষের বিপরীত হয় তখন তাকে তারা পদদলিত করে পিষ্ট করে। নির্বাচনী জালিয়াতি, মানুষের স্বাধীনতাহরণ, সত্য ও ন্যায্য প্রকাশকারীদের মুখবন্ধকরণের ঘটনাগুলো এমন কিছু তিক্ত বাস্তবতা, যা বর্তমান সময়ের ছোট-বড় কনবেশি সবাই জানে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইবাদত ও আনুগত্য কিংবা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিরকের নতুন একটি প্রকার। যেহেতু এতে মহান সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব ও নিঃশর্ত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অধিকারকে বাতিল করে তা মানুষের অধিকার বলে সাব্যস্ত করা হয়।

গণতন্ত্র কুফরি হওয়ার প্রমাণসমূহ

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার স্বরূপ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানবজাতির জন্য আল্লাহ-প্রণীত বিধানের পরিবর্তে মানবরচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলে। আর এটা যে সুস্পষ্ট কুফর, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। শরিয়তের সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলিলের আলোকে এর কুফরি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। নিম্নে আমরা এর কিছু দলিল উল্লেখ করছি।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

‘আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর তাআলার-ই। তিনি আদেশ দিয়েছেন, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।’ (সূরা ইউসুফ : ৪০)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

‘অতএব বিধান দেওয়ার ক্ষমতা কেবল আল্লাহরই, যিনি সর্বোচ্চ ও মহান।’ (সূরা আল-মুমিনুন : ১২)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ

‘আল্লাহ তাআলা কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?’ (সূরা আত-তিন : ৮)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

‘আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেওয়ার ক্ষমতা নেই।’ (সূরা আল-আনআম : ৫৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

‘আর তিনি কাউকে নিজ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে অংশীদার বানান না।’ (সূরা আল-কাহফ : ২৬)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

‘তারা কি মূর্খতা-যুগের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসী জাতির জন্য উত্তম ফয়সালাকারী আর কে হতে পারে?’ (সূরা আল-মায়িদা : ৫০)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

‘আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ করা বিধান অনুযায়ী বিচার করে না সেসব লোকেরাই কাফির।’ (সূরা আল-মায়িদা : ৪৪)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

‘কিন্তু না! তোমার রবের কসম, তারা ইমানদার হবে না; যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর তোমার কৃত ফয়সালার ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে।’ (সূরা আন-নিসা : ৬৫)

ইমাম জাসসাস রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَدَّ شَيْئًا مِنْ أَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ أَوَامِرِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ رَدَّهُ مِنْ جِهَةِ الشَّكِّ فِيهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْقَبُولِ وَالْإِمْتِنَاعِ مِنَ التَّسْلِيمِ. وَذَلِكَ يُوجِبُ صَحَّةَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي حُكْمِهِمْ بِارْتِدَادِ مَنْ أَمْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَقَتْلِهِمْ وَسَبْيِ ذُرَارِيهِمْ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكَمَ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاءَهُ وَحُكْمَهُ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ.

‘এ আয়াতই প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ-নিষেধসমূহ থেকে কোনো একটি বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। চাই সে সন্দেহবশত প্রত্যাখ্যান করুক কিংবা গ্রহণ না করে আত্মসমর্পণ করা থেকে বিরত থাকুক। আয়াতটি সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক জাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদেরকে মুরতাদ আখ্যা দিয়ে তাদেরকে হত্যা করা এবং তাদের পরিবার পরিজনদেরকে বন্দী করার সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করে। কেননা, আল্লাহ তাআলা ফয়সালা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিচার ও বিধানকে মেনে নেবে না সে ইমানদার নয়।’ (আহকামুল কুরআন, জাসসাস : ২/২৬৮, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

আবু বকর রা.-এর যুগে কিছু লোক আল্লাহ তাআলার বিধান জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ না করায় সাহাবায়ে কিরাম তাদেরকে মুরতাদ আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। সন্দেহ নেই যে, এটা ছিল কুফর উৎখাতের ঐতিহাসিক এক লড়াই, যা কিয়ামত পর্যন্ত আগত সবার জন্য সুস্পষ্ট দলিল যে, শরিয়তের অকাট্য কোনো বিধান মেনে নিতে গড়িমসি করলে কিংবা অস্বীকার

করলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। অতএব যে শাসনব্যবস্থা পুরো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করে দিয়ে এ শ্লোগান প্রচার করছে, ‘ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার’ এবং আল্লাহপ্রদত্ত হালালগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ আর হারামগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করছে, তা কি সুস্পষ্ট কুফর নয়? এটাও যদি কুফর না হয়ে থাকে, তাহলে পৃথিবীতে কুফর আর কোনটাকে বলা হবে?

অনেকেরই ধারণা, ‘গণতন্ত্র’ শব্দটি ইসলামের ‘শুরা’ এর সমার্থক। কিন্তু অনেকগুলো কারণে এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা। কতিপয় কারণ নিম্নরূপ :

১. শুরা বা পরামর্শ হয় শুধুমাত্র নিত্যনতুন সমসাময়িক বিষয়াদি এবং কুরআন-সুন্নাহয় যে বিষয়গুলোর বিশদ বিবরণ নেই, সেগুলো নিয়ে। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দ্বীনের অকাট্য প্রমাণিত বিধিবিধানেরও বিরোধিতা করে। অতএব সে নিষিদ্ধ বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে দেয় কিংবা আল্লাহ তাআলা যেটা অনুমোদন বা আবশ্যক করেছেন, তা নিষিদ্ধ করে দেয়। মদ বিক্রির লাইসেন্স এ সংবিধানের দ্বারাই দেওয়া হয়েছে। পতিতাবৃত্তি ও সুদ লেনদেনেরও একই অবস্থা। এ সংবিধানের দ্বারাই বিভিন্ন ইসলামি প্রতিষ্ঠান ও আল্লাহর রাস্তার পথিকদের ওপর সন্ধীর্ণতা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের ওপর করা হচ্ছে কঠিন জুলুম। অতএব শরিয়তের সাথে এর সাংঘর্ষিকতা যখন সুস্পষ্ট, তাহলে এটা শুরা হয় কী করে?

২. শুরা মজলিস গঠিত হয় দ্বীনের পাণ্ডিত্য, ইলম, বিবেক, মেধা, চরিত্র ইত্যাদি বিবেচনায় উত্তীর্ণ একদল যোগ্য লোকের সমন্বয়ে। অতএব এখানে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ও নির্বোধ শ্রেণির সাথে পরামর্শ করার কোনো সুযোগ নেই; কাফির বা নাস্তিকদের ব্যাপার তো দূরে থাক! কিন্তু গণতান্ত্রিক পার্লামেন্ট বোর্ডে এগুলোর কোনোই গুরুত্ব নেই। এজন্য এখানে একজন কাফির, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ও নির্বোধও প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাহলে বুঝাই যাচ্ছে, মৌলিকভাবে ইসলামি শুরাব্যবস্থার সাথে এর কত ব্যবধান!

৩. শুরা মজলিস রাষ্ট্রপ্রধানকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতে পারে না। প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে এবং অন্য সদস্যদের তুলনায় কারও মতকে অধিক সঠিক মনে করায় তিনি কখনো একজনের মতকেও প্রাধান্য দিতে পারেন। এর বিপরীত সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের ঐক্যমত-সমর্থিত সিদ্ধান্ত জাতির

জন্য অবশ্যপালনীয় আইনে পরিণত হয়ে যায়, যা কেউই প্রত্যাখ্যান করতে পারে না; এমনকি সরকারপ্রধানও নয়।

এ ধরনের আরও বিভিন্ন পার্থক্য রয়েছে, যা স্পষ্ট করে দেয় যে, শুরাব্যবস্থা ও গণতন্ত্র কখনো এক জিনিস নয়। উভয়ের মাঝে বাহ্যত কিছু মিল দেখা গেলেও মৌলিকভাবে উভয়ের মাঝে রয়েছে বৈপরীত্য ও সুস্পষ্ট ব্যবধান। মোটকথা, গণতন্ত্র হলো স্পষ্ট শিরকি ও কুফরি একটি ব্যবস্থা, আর বিপরীতে শুরা হলো শরিয়া-সমর্থিত ও ইসলামি শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। তাই উভয়টির মাঝে সমন্বয় করার চেষ্টা করা এবং দুটিকে এক বলে সাব্যস্ত করা মূর্থতা ও গোয়ার্তুমি বৈ কিছু নয়।

আমাদের অসংখ্য আলিম ও বিজ্ঞ ফকিহ গণতন্ত্রকে ইসলাম পরিপন্থী ও কুফরি তন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। এদেরকে আমরা অনেকেই আকাবির মানি, কিন্তু দলীয় স্বার্থের এ জায়গায় এসে নিজের নেতার মতকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এসব আকাবিরকে আমরা ঠিকই ছুড়ে ফেলতে পারি! আমরা অসুবিধা দেখলে সতর্কভাবে লুকিয়ে রাখতে চাই, আর স্বার্থের বেলায় শত জোড়াতালি দিয়ে হলেও নিজেদের মত প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা করি! এই হলো আমাদের স্বভাব, যা আমাদের হক পথের দিশা পেতে অন্যতম এক অন্তরায়। যাই হোক, কেউ মানুক চাই না মানুক, আমরা এখানে গণতন্ত্রের অসারতা ও এর কুফরি নিয়ে কতিপয় বিজ্ঞ আলিমের উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। নিশ্চয়ই এতে হকপ্রত্যাশীদের জন্য রয়েছে উত্তম খোরাক।

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রহ. বলেন :

غرض اسلام میں جمہوری سلطنت کوئی چیز نہیں... یہ مختارہ متعارفہ جمہوریت محض گھڑا ہوا ڈھکوسلہ ہے، بالخصوص ایسی جمہوری سلطنت جو مسلم و کافر ارکان سے مرکب ہو وہ تو غیر مسلم سلطنت ہی ہوگی۔

‘মোটকথা, ইসলামে গণতান্ত্রিক শাসন নামে কিছু নেই। ...এই নবআবিষ্কৃত প্রচলিত গণতন্ত্র শুধুই মনগড়া প্রতারণা। বিশেষত এমন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, যা মুসলিম ও কাফের সদস্যদের নিয়ে গঠিত, সেটাকে তো অমুসলিম শাসনব্যবস্থাই বলতে হবে।’ (মালফুজাতে থানবি : ২৫২)

۲. ماوولانا اءءرلس كانكلاو رها. ولنن :

وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مزدور اور عوام کی حکومت ہے، ایسی حکومت بلاشبہ حکومت کانفرہ ہے۔

‘وہ سب لوک اکٹھا بلے یے، اءٹل جنساٹارن او اٹمک مءءءورءوں راسٹل۔ امان راسٹل نل:سنءهه کوفورل راسٹل’ (اكارلءءول اسلام: ۲۳۰، ٱركاشنل : اءءارالے اسلامللماولا، كراچل)

۳. االاماما ساءللءل سولالمان نءلل رها. ولنن:

ہمیں تو اسلام میں کسں بھی مغربل جمهورلٹ نظر نہیں آتا اور اسلامی جمهورلٹ تو کوئل ٱلزل ہی نہیں، معلوم نہیں اقبال مرحوم کو اسلام کی روح میں یہ جمهورلٹ کہاں سے نظر آئل؟ جمهورلٹ اکل خاص تہذلپ و تارلخ كا شمره ہے، اسے اسلامی تارلخ میں ڈھونڈنا معذرت خواہل ہے۔

‘ٱشكلا ما گناتلننر نلما اسلالمر كوٹا او امارءوں ءٹللوچار هال نا اار اسلالما گناتلننر بلتے كوئو ائلسل ائ نل. ائلل نا، مرهئم اكلبال اسلالما اءءشوںر مءطه ائ گناتلننر كوٹال ٱلنن؟ گناتلننر اكلٹل وشلما ائتلااس او ساءلار فلل. اسلالما ائتلااسے ار انوسكان كرائل انرركا’ (ماسك ساناوئل، كراچل : ۲/۲۹-۲۲، سٹلا : ۱۱-ا مء، ۲۰۱۳ ائ)

۴. هاكلمول اسلام كارل ائللل رها. ولنن :

یہ (جمهورلٹ) رب اعال کی صفت ملكلٹ میں بھی شرک ہے اور صفت علم میں بھی شرک ہے۔

‘ا گناتلننر االماھ ااالار رالئلنر اونوںر مءطه او شلرک ابلنر اارل ائلما اونوںر مءطه او شلرکا’ (ااءلئان كل اءل : ٱ. نل ۴۴، ٱركاشنل : اءءارالے ائللنل، ٱاكلسانل)

۵. مولفأل رللل ااهمء لوءلئانل رها. ولنن :

یہ تمام برگ وبار مغربل جمهورلٹ كے شجره ٱلءلشہ کی ٱلءءار ہے۔ اسلام میں اس

کافرانہ نظام کی کوئی گنجائش نہیں، نہ ہی اس طریقے سے قیامت تک اسلامی نظام آسکتا ہے۔

‘বিশ্বময় অস্থিতিশীল ও বিশৃঙ্খলাময় এ পরিবেশ পশ্চিমা গণতন্ত্রের নিকৃষ্ট বৃক্ষের ফসল। ইসলামে এ ধরনের কুফুরি ব্যবস্থাপনার কোনোই অবকাশ নেই। আর না এ পদ্ধতিতে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।’ (আহসানুল ফাতাওয়া : ৬/২৬, প্রকাশনী : এইচ. এম. সাইদ. কোম্পানি, করাচি)

৬. মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবি রহ. বলেন :

بعض غلط نظریات قبولیتِ عامہ کی ایسی سند حاصل کر لیتے ہیں کہ بڑے بڑے عظماء (اور عالم کہلانے والے بھی) اس قبولیتِ عامہ کے آگے سر ڈال دیتے ہیں، وہ یا تو ان غلطیوں کا ادراک ہی نہیں کر پاتے یا اگر ان کو غلطی کا احساس ہو بھی جائے تو اس کے خلاف لب کشائی کی جرأت نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جو بڑی بڑی غلطیاں رائج ہیں، ان کے بارے میں اہل عقل اسی لئے المیے کا شکار ہیں! اسی غلط قبولیتِ عامہ کا سکہ آج ”جمہوریت“ میں چل رہا ہے۔ جمہوریت دورِ جدید کا وہ ”صنمِ اکبر“ ہے جس کی پرستش اول اولِ دانیانِ مغرب نے شروع کی۔ چونکہ وہ آسمانی ہدایت سے محروم تھے، اس لئے ان کی عقلِ نارسا نے دیگر نظامِ ہائے حکومت کے مقابلے میں جمہوریت کا بت تراش لیا اور پھر اس کو مثالی طرزِ حکومت قرار دے کر اس کا صورِ بلند آہنگی سے پھونکا کہ پوری دنیا میں اس کا غلغلہ بلند ہوا، یہاں تک کہ مسلمانوں نے بھی تقلیدِ مغرب میں جمہوریت کی مالا جچنی شروع کر دی۔ کبھی یہ نعرہ بلند کیا گیا کہ، ”اسلام جمہوریت کا علم بردار ہے“ اور کبھی، ”اسلامی جمہوریت“ (جیسی خبیث اصطلاح) وضع کی گئی۔ حالانکہ مغرب، ”جمہوریت“ کے جس بت کا پجاری ہے، اس کا نہ صرف یہ کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ اسلام کے سیاسی نظریہ کی ضد ہے۔ اس لئے اسلام کے ساتھ جمہوریت (یا اس کی اصطلاحات) کا پیوند لگانا اور جمہوریت کو مشرف بہ اسلام کرنا صریحاً غلط ہے۔

‘কিছু কিছু ভুল দর্শন অনেক সময় এমন গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যায় যে, বড় বড় বুদ্ধিজীবী (ও আলিম নামধারীরাও) তা অবনত মস্তকে মেনে নেয়। তারা হয়তো

এ ভুল অনুধাবনই করতে পারে না কিংবা অনুধাবন করলেও তার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহস পায় না। পৃথিবীতে যত বড় বড় ভুল প্রচলিত আছে সেগুলোর জন্যই জ্ঞানীদের ভোগান্তির শিকার হতে হয়। এ ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার ভুলের ধারা আজ গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে চলছে। গণতন্ত্র অধুনা সময়ের ওই বড় মূর্তি, প্রথম প্রথম যার পূজা পশ্চিমা বিশ্বের বুদ্ধিজীবীরা শুরু করেছিল। যেহেতু তারা আসমানি হিদায়াতের আলো থেকে বঞ্চিত ছিল, তাই তাদের অপরিপক্ক বিবেক অন্যান্য শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে গণতন্ত্রের মূর্তি বেছে নিল। এরপর এটাকে আদর্শ শাসনব্যবস্থা আখ্যা দিয়ে পুরো বিশ্বে এর আওয়াজ উঁচু করল। এতে সারাবিশ্বে সাড়া পড়ে গেল; এমনকি মুসলামানরাও পশ্চিমাদের তালে তালে তাদের গুণগান গাওয়া শুরু করল। কখনো এ আওয়াজ তুলল যে, ইসলাম হলো গণতন্ত্রের পতাকা বাহক। আবার কখনো ইসলামি গণতন্ত্র জাতীয় জঘন্য পরিভাষা তৈরি করল। অথচ পশ্চিমাংশ যে গণতন্ত্রের পূজা করে, ইসলামের সাথে তা কেবল সম্পর্কহীন নয়; বরং তা ইসলামি রাজনৈতিক ও শাসনব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক। এজন্য ইসলামের সাথে গণতন্ত্র বা তার পরিভাষাগুলো মিলানো এবং গণতন্ত্রকে ইসলামের সাথে মিশ্রিত করা স্পষ্ট ভুল।’ (আপকে মাসায়িল আওর উনকা হল : ৭/৬৫৭, সিয়াসাত অধ্যায়, প্রকাশনী : মাকতাবা লুখিয়ানবি, করাচি)

৭. মুফতি মাহমুদ রহ. বলেন :

ہم جمہوریت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس میں تو دو مردوں کی آپس میں شادی کی اجازت ہے۔ جیسا کہ برطانیہ نے اس کا بل کثرت رائے سے پاس کیا ہے۔

‘আমরা গণতন্ত্রের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করি। এ তন্ত্রে তো পুরুষদের পরস্পরে সমকামী বিবাহের বৈধতা রয়েছে। যেমন ব্রিটেনে অধিকাংশের ভোটের পক্ষে বিল পাশ হয়েছে।’ (ইসলামি খিলাফত : পৃ. নং ১৭৭)

৮. মাওলানা আশিকে ইলাহি বুলন্দশহরি রহ. বলেন :

ان کی لائی ہوئی جمہوریت بالکل جاہلانہ جمہوریت ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

‘এদের আনিত গণতন্ত্র সম্পূর্ণ জাহিলি একটি ব্যবস্থাপনা, ইসলামের সাথে যার কোনোই সম্পর্ক নেই।’ (তফসিরে আনওয়ারুল বয়ান : ১/৫১৮)

۹. مؤفاتی نلآامؤدین شامآای شہد رھ. বলেন :

آیسا کہ پیشاب کے ذریعے کبھی وضو نہیں ہو سکتا اور جیسا کہ نجاست کے ذریعے سے کبھی طہارت اور پاکی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ اسی طرح سے لادینی اور مغربی جمہوریت کے ذریعے سے کبھی اسلام غالب نہیں آسکتا۔۔۔ دنیا میں جب بھی اسلام غالب ہوگا تو اس کا واحد راستہ وہی ہے۔۔۔ جو راستہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔۔۔ اور وہ جہاد کا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہوگا۔

‘یہمن پشاور دوارا کখনو آجو ہن نا اہن نا پاکر دوارا کখনو پبیترا تا ارجن ہن نا، تہمن دہمینتا و پشیمآا گناتہنر ماڈیمے کখনو اسیلامر بجز آساتے پارے نا۔ پٹیبیتے اسیلامر بجز ارجنر اکٹئی اُپای، یے اُپای راسولللاہ سالللاہ آلایہی ویا سالللاہ اُہن کررہن۔ آار سٹا ہلوا جیہادر راسٹا، یار ماڈیمے ا پٹیبیتے آاللہر دین بجزی ہوے’ (ماسیک سانابیل، کراچی : ۷/۷۷، سنآیا: ۱۱-ئی مے، ۲۰۱۷ اُہن)

۱۰. مؤفاتی تاکی اسیمانی ہافی. বলেন :

مغربی جمہوریت جسکی بنیاد «عوام کی حکمرانی» کے تصور پر ہے، اسلام کے قطعی خلاف ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد «اللہ کی حاکمیت اعلیٰ» کے عقیدے پر ہے جسے قرآن کریم نے «ان الحکم الا للہ» کے مختصر جملے میں ارشاد فرمایا ہے، لہذا مغربی جمہوریت کو اپنے تمام تصورات کے ساتھ برحق سمجھنا عصر حاضر کی بدترین گمراہیوں میں سے ہے۔

‘پشیمآا گناتائیک بایبٹا، یار بیتی جن گنر شاسنکمتار آتہنار وپر، تا سونیشیتاوارے اسیلام پرپٹئی۔ کیننا، اسیلامر بیتی ہلوا “آاللہ ساروٹ کمتار مالیک” ا بٹشاسر وپر۔ کوران ماآیڈے یا سنکفپے ان الحکم الا للہ تها “شاسنکمتا اکماتر آاللہر-ئی جنی” بلے اُرشاد ہرہوے۔ سوتران ساریک ببببنا پشیمآا گناتائیک ہک منے کرا بترمان یوگر آڈناتم آائیتولار انیاتم’ (فاتا ویاے اسیمانی : ۷/۷۰۹، پرکاشنی : ماکتابا ماآاریفول کوران، کراچی)

এছাড়াও আর অসংখ্য আলিমের ফতোয়া আছে, যা পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত করে যে, গণতন্ত্র হলো সুস্পষ্ট ইসলামবিরোধী ও কুফরি একটি মতবাদ। অতএব এ ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে কুফরি শাসনব্যবস্থা বলেই বিবেচিত হবে। আর ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, কোনো রাষ্ট্রে যদি কুফরি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে অধিকাংশ ফকিহদের মতানুসারে সেটা ‘দারুল হারব’ হবে; যদিও তার অধিকাংশ নাগরিক মুসলিম হোক। সুতরাং এর ভিত্তিতে বর্তমানের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর বিধান বুঝাটাও আমাদের জন্য সহজ হয়ে গেল।

আল্লামা আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ রহ. ‘দারুল হারব’-এর একটি প্রকার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন :

دار الردة: وهي فرع من دار الكفر الطاريء، وهي التي كانت دار إسلام في وقتٍ ما ثم تغلب عليها المرتدون وأجروا فيها أحكام الكفار، مثل الدول المسماة اليوم بالإسلامية

“দারুল রিদা”। এটা বস্তুত “তারি দারুল কুফর”-এরই একটি প্রকার ও শাখা। এটা ওই দেশ, যা কোনো এক সময় “দারুল ইসলাম” ছিল। অতঃপর মুরতাদরা (যারা বংশসূত্রে মুসলিম হলেও পরে নানা কুফরি কর্মকাণ্ড করায় প্রকৃত অর্থে কাফির) তা জবরদখল করে সেখানে কাফিরদের আইনকানুন চালু করেছে। যেমন : বর্তমানের নামসর্বস্ব ইসলামি রাষ্ট্রগুলো।’ (আল-জামিউ ফি তালাবিল ইলম : ২/৬৪৫, প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ)

এ থেকে বুঝা যায়, বর্তমানে আমরা যেসব গণতান্ত্রিক দেশকে মুসলিম দেশ বলে থাকি, সেগুলো শরয়ি দৃষ্টিতে ‘দারুল হারব’-এর অন্তর্ভুক্ত। এসব দেশকে শরয়ি পরিভাষায় ‘দারুল রিদা’ বলা হবে, যা মূলত ‘দারুল হারব’-এরই একটি প্রকার। মুসলিম দেশ বলা হয় তার নাগরিকদের দিকে লক্ষ করে। কেননা, এসব দেশের অধিকাংশ নাগরিক মুসলিম। তাই এ ধরনের দেশকে মুসলিম দেশ বলা যাবে, কিন্তু ইসলামি দেশ বলা যাবে না।

উল্লেখ্য যে, গণতন্ত্র কুফরি মতবাদ হলেও সাধারণ নাগরিক যারা এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান না জানায় অজ্ঞাতসারে গণতান্ত্রিক সিস্টেমে ভোট দেয়, এ

ব্যবস্থাকে সাপোর্ট করে, জীবনকে এ পথেই পরিচালিত করে, অন্যদিকে আবার সে ইসলামের বাহ্যিক কিছু ইবাদতও পালন করে, তাদের নির্দিষ্ট কাউকে শুধু গণতন্ত্র চর্চার কারণে কাফির বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা, কুফর ও তাকফির (কাফির বলা) এক জিনিস নয়। কারও মধ্যে নিশ্চিত কুফর থাকা সত্ত্বেও মাওয়ানিউত তাকফির (কাফির বলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক কারণসমূহ) হতে কোনো একটি থাকলে তাকে আর কাফির অভিধায় অভিহিত করা যায় না। এ ব্যাপারে ‘তাকফিরের মূলনীতি’ নামে আমাদের একটি বই আছে, যাতে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা রয়েছে। তবে যারা গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, রক্ষাকর্তা ও ধারকবাহক, তাদের বিধান ভিন্ন। এ ব্যাপারে আমাদের অন্যান্য আর্টিকলে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য এটা যে, আমরা যেন কুফর ও তাকফিরকে এক না ভেবে বসি। উভয়ের মাঝে অনেক পার্থক্য আছে। মোটকথা, গণতান্ত্রিক দেশগুলো যে কুফরি ব্যবস্থায় পরিচালিত, যার ভিত্তিতে দেশগুলো ‘দারুল হারব’-এর অন্তর্গত, তা বুঝানোই আমাদের উদ্দেশ্য। এর অতিরিক্ত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে কারা কাফির, আর কারা কাফির নয়, তা আমাদের এ আলোচনার অন্তর্গত নয়। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বিষয় সঠিকভাবে বুঝার তাওফিক দান করুন এবং সদাসর্বদা হক ও ন্যায়ের ওপর অটল রাখুন।